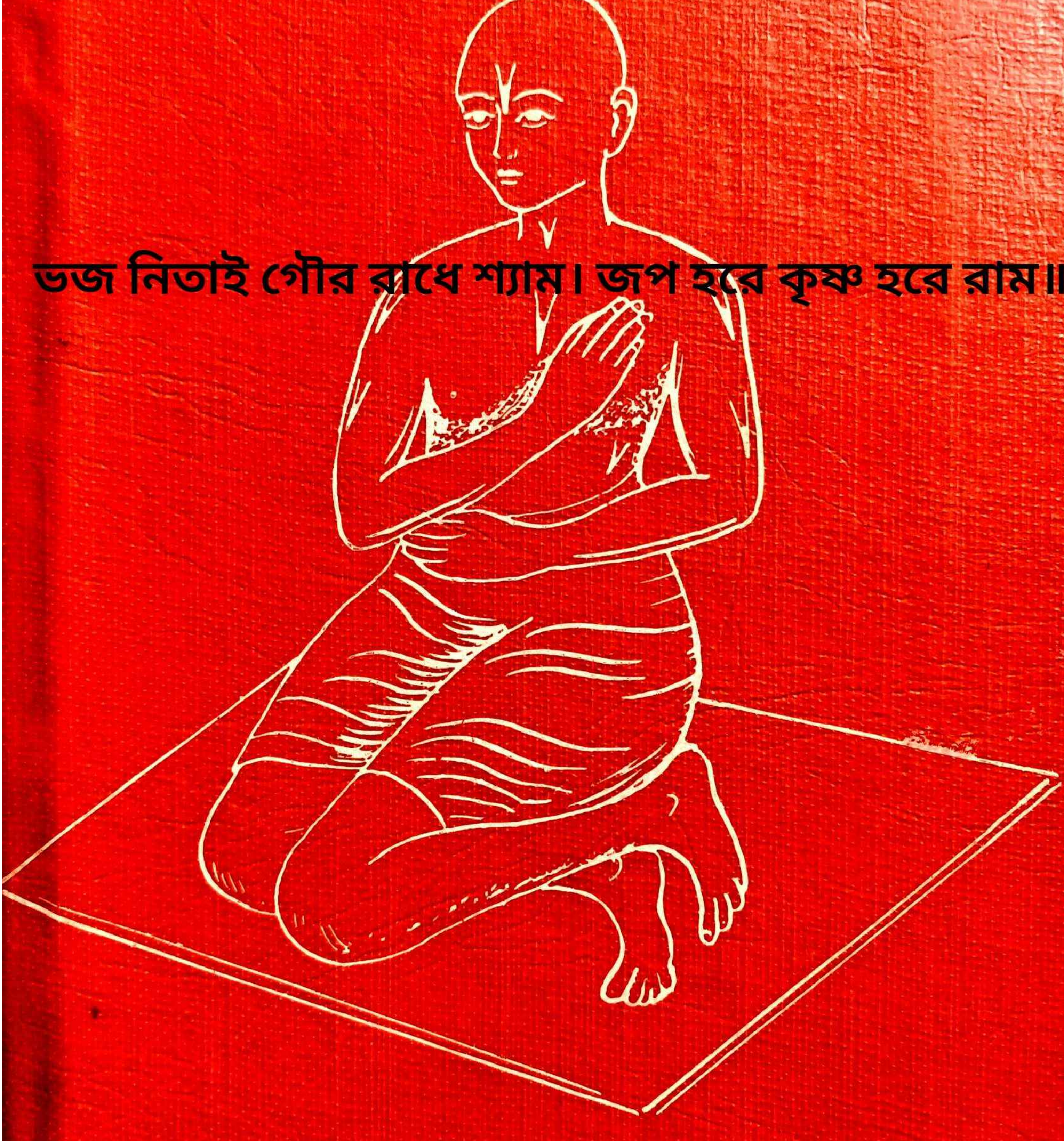
শ্রীনীলাচলে ব্রজ-মাধুরী

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥



শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীনীলাচলে
ব্রজ-মাধুরী

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত

—•—

প্রকাশক

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চশতী সমারোহ
পোঃ চাকুলিয়া-৮৩২৩০১
জিলা—সিংভূম (বিহার)

প্রকাশন তিথি -
গঙ্গা-দশহরা (গৌরাব্দ-৪৯৯)
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২
29th May, 1985

মূল্য—দশ টাকা
Price—Rs. 10/-

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতী মহোৎসব উপলক্ষে তাঁহার জীবন চরিত্র আধারিত যে সকল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য তাহার পুনঃপ্রকাশনের সিদ্ধান্ত লইয়া আমরা কতিপয় গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছি। ইহার মধ্যে শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত "গম্ভীরার শ্রীগৌরাঙ্গ" অন্যতম। লেখকের অপর গ্রন্থ "নীলাচলে ব্রজমাধুরী"—যাহার পুনঃপ্রকাশনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিন হইতেই আমাদের ছিল। কিন্তু উক্ত দুর্লভ গ্রন্থ সহজলভ্য না হওয়ার জন্য প্রকাশন কার্য্য সম্ভবপর হয় নাই।

সম্প্রতি গীতাপ্রেস, গোরখপুরের 'কল্যান' বিভাগের পুস্তকালয় হইতে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে; এবং উক্ত গ্রন্থ হইতে অফসেট্ মুদ্রনে এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থের বিক্রয় মূল্য কেবল মুদ্রনের ব্যায়-মাত্রা অনুযায়ী রাখা হইয়াছে।

সহৃদয় ধর্মপ্রাণ ভক্ত-পাঠকগণ এই গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য।

ভবদীয়—

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চশতী সমারোহ

পোঃ চাকুলিয়া (জিলা সিংভূম)

বিহার—৮৩২৩০১

অবতরণিকা ।

মানুষের আত্মা বহির্ম্মুখ অবস্থায় এ জগতের ব্যাপারে ভুলিয়া থাকে, এই ভ্রম হইতেই অশেষ যাতনা ঘটে। জীব নিজের বিশুদ্ধ প্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জগতের অনিত্য সুখ-দুঃখে বিব্রত হইয়া পড়ে। সদ্‌গুরুর ও সৎশাস্ত্রের উপদেশে এই ভ্রম তিরোহিত হইলে জীবের বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রকাশ পায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তাহার নিত্য সাথীর কথা মনে পড়ে,—সে সাথী যে কত সুন্দর,—কত মধুর,—কত রসময় সুহৃদ্—তখন সেই জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়; আর উহার সঙ্গে সঙ্গেই অতীত অনুরাগের মধুময়ী-স্মৃতি বলবতী হইয়া উঠে। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলতার সূত্রপাত হয়। বিরহ-বিধুরা ব্রজবালার ন্যায় আত্মা তাঁহার মধুময় নিত্য সখা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে। ইহাই আত্মার স্বাভাবিকী অনুরাগময়ী উপাসনা। এই ভাবেই ব্রজরসোপাসনার সূত্রপাত হয়। ব্রজরস-নিষ্ঠ আত্মা স্বভাবতঃই কুসুম-কোমল। কুসুমকোমলাবৃত্তির প্রভাবে মানব আত্মা ব্রজবালার ভাবে বিভাবিত হয়; বিরহ-বিধুরা অনুরাগময়ী-প্রণয়িনী যেমন তাঁহার প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল হয়, এতাদৃশ আত্মাও তাদৃশী রমণীর ভাবে প্রাণের প্রিয়তম চির-সুন্দর চির-মধুর চির-সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করে।(১)

---

(১) পাশ্চাত্য পণ্ডিত নিউম্যানেরও এইরূপ ধারণা। তিনি তাঁহার "আত্মা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness it must become a *Woman* ; yes, however manly thou be among men. It must learn to love being dependent and must lean on God not solely from distress or alarm but because it does not like independence or loneliness. It must not have recourse to Him merely as to a friend in need, under the strain of duty, the battering of

জীবাত্মার সহিত শ্রীভগবানের নিত্য সম্বন্ধ। সম্বন্ধ-ভেদে উপাসনা ভেদ। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের সাধকগণ আপন আপন ভাব অনুসারে শ্রীভগবানের ভজন করেন। কিন্তু মধুরভাবেই সর্ব্বপ্রকার ভাব বিরাজমান। শ্রীভগবানের উপাসনায় মধুরা রতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

---

affliction and the failure of human sympathy, but it must press towards Him when there is no need.

* * * *

They (souls) too, seem to be infinite in thier cravings ; who but He can satisfy them ? Thus a restless instinct agitates the soul guiding it dimly to feel, that it was made for some definite unknown relation towards God. *The sense of emptiness increases to positive uneasines*, until there is an inward yearning, if not shaped in words, yet in substance not alien from that ancient strain.—'As the hart panteth after the water-brooks, so panteth my soul after Thee, O God—'I wait for the Lord ; my soul doth wait, as those that watch for the morning.' But by the continuance of such exercises, the fervency of desire gradully ripens into love and love goes on heightening till at last the soul becomes concious of it."

In claiming a *Personal* relation with God, nothing *exclusive* is intended ; nay, he who thus learns that he is loved by God, learns simultainously that all other men and creatures are also loved : (though a hateful dogma may here mar his soul's instinct). That is an important lesson for the man's external action; indeed is a foundation of universal love in the soul ; but the inward move-ments towards God proceed excactly as if *there were no other creature beside itself in the universe*. Thus the discovery that it loves, and

ব্রজবালাগণ এই উজ্জ্বল মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার যে রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই রসময় বিশুদ্ধ আত্মার পক্ষে উপাসনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হৃদয়ের পূর্ণ অনুরাগে এমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা

---

is loved in turn produces sensible joy ; in some nature very powerful, in all imparting cheerfulness, hope, vivacity. The personal relation sought, is discerned and felt. The soul understands and knows that God is *her* God ; dwelling with her more closely than any creature can ; yea, neither Stars, nor Sea nor smiling Nature hold God so intimately as the bosom of the soul.

What is He to it ? What, but the Soul of the soul. It no longer seems profane to say 'God is my bosom friend. God is for me and I am for Him."

So Joy bursts out into praise and all things look brilliant, and hardship seems easy and duty becomes delight, and contempt is not felt and every morsel of bread is sweet. then, though we know that the physical universe has fixed unaltering laws, we *can not help* seeing God's hand in events, Whatever happens we think of as his mercies, his kindnesses or his visitations and his chastisements ; every thing comes to us from his love : thus the whole world is fresh to us with sweetness before untasted. All things are ours whether afflictions or pleasure, health or pain. Old things are passed away ; behold ! all things are become new and the soul wanders and admires and gives thanks, and exults like the child on a summers's day ;—and understands that she is a new-born child. She has undergone a new birth ! It is not a birth after the flesh, but a birth of the Spirit,—birth into a heavenly union,—birth into the family of God. Why need she scruple to say, that she is partaker of the

আর কোনও প্রণালীতে পরিলক্ষিত হয় না। অনুরাগের পূর্ণ প্রবলতম প্রবাহে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসুধারূপ রসে নিমজ্জিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করেন। এই গ্রন্থের উপসংহারে আত্ম-নিবেদনের পদ দেওয়া হইয়াছে। (২) উহা মধুর ভজনের পরাকাষ্ঠা। সে

---

divine nature, if God loves her and dwells in her bosom ?

* * * *

The single thought, 'God is for my soul and my soul is for Him," suffices to fill a universse of feeling and gives rise to a hundred mataphors. Spritual persons have exhausted *human relation ships* in the vain attempt to express thei full sense of what God is to them. Father, brother, friend, king, master, guide, shepherd are common tittles. But what has been said, will show why a still tenderer tie has ordinarily presented itself to the Christian imagination as a very appropriate mutaphor—that of Marriage. The habit of breathing to God our most secret hopes, sorrows, complaints, and wishes in unheard whisper with the consciousness that he is always inseperable from our being perhaps pressed this comparison forward.

(২) নিউম্যানের এই গ্রন্থে আত্ম-নিবেদনের (self-consecration) ভাবের আভাসও দৃষ্ট হয় যথা :—

They (Soul) thus undergo a Spiritual Marriage. We have seen the longings of the soul to covet Gods's transitory visits into an abiding and indisoluble union. It makes a covenant with God and pledges itself to Him well-assured, that he accepts the pledge.

"Not now only, O my Lord," it exclaims, "but henceforth and always, Thou art mine and I am thine. I have known some what of thy gloriousness and and loveliness : I have loved Thee a little, this heart has been thy dwelling

উপাসনার রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র আস্বাদন পাইলেও জীব কৃতার্থ হয়। কিন্তু সে অধিকার জীবের পক্ষে সুদুর্ল্লভ। মায়াবদ্ধ জীব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির আপাতরম্যভোগ্য বিষয়েই প্রমত্ত। অখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবানের প্রতি মাধুর্য্যময়ী অনুরাগ লাভ মহা-সাধনাপেক্ষ। সাধনায় আত্মা বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু আত্মা কেবলমাত্র বিশুদ্ধি-লাভ করিলেও ব্রজরসের উপাসনার অধিকারী হইতে পারেন না। আত্মার বিশুদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু পরাভক্তির উদয় না হইলে রস-ব্রহ্মের উপলব্ধি অসম্ভব। রসানুভব ব্যতিরেকে আত্মার পূর্ণতা হয় না। জ্ঞানে আত্মার বিকাশ ঘটে, কিন্তু উহাতে উহার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভাবিত হয় না, প্রেমই আত্মার স্বরূপ। শ্রীভগবান্‌ও প্রেম-স্বরূপ। জ্ঞান প্রেমেরই অন্তর্ভূত। প্রেমেই জ্ঞানের চরমাতৃপ্তি, প্রেমেই জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি।

শ্রীভগবান্ গম্ভীরালীলায় এই সাধনার প্রণালী প্রেমিক ভক্ত-সমাজে প্রকটিত করিয়াছেন। সেই প্রণালীর লেশাভাস আস্বাদন করিতে পারিলেও বৈষ্ণব সাধকের জীবন কৃতার্থ হয়। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণ কাব্য-রসের আশ্রয়ে ব্রজরস উপাসনার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের মূর্ত্তি প্রকটন করিতে হইলে কাব্যের ভাষাই উহার প্রধান সাধন।(৩)

---

place. Now do I claim that my Lord shall never go away but dwell here inseperably and eternally."

It is therefore very far indeed from a gratuitous phantasy to speak of this as a marriage of the soul to God. No other metahor in fact will express the thing. p. 213.

(৩) And here-in lies the fundamantal union of poetry and religion. Hence is it that the ancient Bard Vates, or Prophet, united the characters of poet and religious teacher, and in fact to feed upon the higher and sublime poetry an exercise of the soul—a preperation at best for actual religion. Its similarity to religious meditations is in many respects evident. As the

বৈষ্ণব কবিগণের লীলারস-পদাবলী চির-নূতন চির-মধুর ও চির-সুন্দর। উহাদের প্রতি পদেই সুধা-মাধুরী উৎসারিত—প্রেমিক ভক্তগণের মানসনেত্র সমক্ষে এই সকল পদাবলী ব্রজরসের অনন্ত-মূর্ত্তি উপস্থাপিত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি-রসে অভিষিক্ত করে—তাঁহারা মহাযোগীর ধ্যান অপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল ভাবে এই সকল পদে ভগবৎ রসের বিবিধ মধুর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমানন্দে নিমজ্জিত হয়েন—এই সকল পদ তাঁহাদের উপাসনার মহামন্ত্র-স্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরামন্দিরের নিভৃত কক্ষে অবস্থান করিয়া অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদগণের সহিত এই রসকীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন এবং এই সকল পদকীর্ত্তনেই তিনি শ্রীভগবানের বিবিধ মধুর-লীলারস আস্বাদন করিতেন। বিষয়ী-ব্যক্তিবর্গ সংসারের কোলাহল হইতে সময়ে সময়ে নির্ম্মুক্ত হইয়া—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুব শরণ লইয়া তাঁহারই শ্রীচরণ-নখ-চ্ছটার আলোকে এই সকল ব্রজ-রস-লীলা-মাধুরীময় পদে অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবানের লীলা-রস-আস্বাদনের কিঞ্চিৎ সন্ধান পাইতে পারেন ইহাই আমার ধারণা এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দচরণে রতিরস্তু।

---

same hymn of praise and love may be daily recited and wearies not ; as no new information for the understanding is coveted ; so the same lines of the poet eternally delight the more, perhaps because they are old. We dwell upon each word and find the imagination more and more stimulated ; it is a never-ending feast ; for the wise poet does not limit his hearers to his own mind but leaves room for them to range byond him if they can. Ibid Chap. I.

নিবেদন

"গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্ত ও সাহিত্য-রসাস্বমোদী পাঠকগণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া আশাতিরিক্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ দীন লেখকেরপ্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। আমি জানি—আমি তাঁহাদের এই এই অসীম কৃপা-লাভের একান্তই অনুপযুক্ত। শ্রীশ্রীগৌরলীলার বহিরঙ্গ কথাও লিখিয়া প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার নাই, ভাব-গম্ভীরা রসময়ী গম্ভীরা-লীলা লেখা ত অতি দূরের কথা,—উহা বুঝিবারও অধিকার আমার পক্ষে একান্ত দুর্ল্লভ। বামনের চাঁদ ধরার উপহাসাস্পদ প্রয়াসের ন্যায় অখিলপ্রেমরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীরা-লীলা লেখার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আমা দ্বারা উহা সুসম্পন্ন হয় নাই, হওয়ার আশাও নাই—কিন্তু তথাপি ভক্ত পাঠকগণ ও বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ এই গ্রন্থের সমাদর করিয়াছেন—ইহা কেবল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নাম ও লীলারই মহামহিমা। ভুবনানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গলীলার এমনই মাহাত্ম্য!

এ ক্ষুদ্র জীবনের তিন চতুর্থাংশকাল চলিয়া গিয়াছে; আর যে অধিক দিন বাঁচিব এমন ভরসা নাই। ভজনযোগ্য এমন নরদেহ পাইয়াও শ্রীগৌরলীলার রসসুধা আস্বাদন করিতে প্রয়াস পাই-লাম না—এদুঃখ রাখিবার স্থান নাই। মনে করিয়াছিলাম শ্রীশ্রীগম্ভীরালীলা লেখার সময় যদি কিছু সুবিধা হয়, যদি কৃপা

করিয়া প্রভু কিঞ্চিৎ আবেশেভাব-লাভের সুবিধা দেন তবে সেই লীলাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়াও কৃতার্থ হইব। কিন্তু সে আশা পূরিল না।

"মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু।"

"গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থে গম্ভীরালীলার বিচার-বিশ্লেষণ করিতে করিতেই সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠার গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে—সে রস-সুধার কথা তুলিতে তুলিতে সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণেরও আলোচনা করা হইয়াছে। রসাস্বাদনের প্রয়াস বিচার-প্রয়াসে মিলিয়া মিশিয়া উক্ত গ্রন্থখানি বিচারজ্ঞ সুপণ্ডিত ভক্ত ও সাহিত্যিকগণের কিঞ্চিৎ মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ হইলেও উহাতে আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমি নিজে লিখিয়া আমার তৃপ্তি জন্মাইতে পারিব,—এ আশাভরসাও আমার নাই।

কিন্তু তথাপি এ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার প্রয়াস একবার ত্যাগ করিতে পারি নাই। নিদাঘতাপে তাপিত তৃষিত পথিকের প্রাণ সুস্বাদু সুমধুর শীতল পানীয় দ্বারা যেমন পরিতৃপ্ত হয়, পলারে তেমন তৃপ্তি পায় না। সিদ্ধান্ত-বিচারে প্রাণের তৃপ্তি হয় না। তাই আবার এ প্রয়াস।

মনের একটা কথা প্রকাশ করার যোগ্য নয়, কিন্তু না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। শান্তিদায়িনী নিদ্রা দীর্ঘকাল আমায় ত্যাগ করিয়াছেন। প্রতি রজনীতে নীরব নিশীথে জগতের কোলাহল যখন মিটিয়া যায়, আমার অনিদ্র হৃদয়ে

তখন যেন কোন অজানা দেশ হইতে গৌরগম্ভীরার গম্ভীর বিরহ-গীতির সুরতরঙ্গ জাগিয়া উঠে। সেই নীরব গীতি আমায় অধীর করিয়া তোলে, আমি না পারি ঘুমাইতে—না পারি স্থির হইয়া থাকিতে। নাম-জপে যে সুখ ছিল, তাহাও এখন নাই।

এই অবস্থায় তিন বৎসরকাল অতিবাহিত হইতেছে। সময়ে সময়ে এই অবস্থার কোন কোন কথা লিখিয়া রাখি,—তাহাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপাদান। বসন্তের নৈশ নীলাকাশ, নিদাঘের তাপ, বর্ষার মেঘ, শরতের স্ফুটচন্দ্রতারকা ও শীতের হিমানি এবং আমার বাস গৃহের সম্মুখস্থ নীপতরু—ইহারা এই বিনিদ্র দীনজনের নৈশ সুহৃদ্—ইহারাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রধানতম সহায়।

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ব্রজরস-সাধনার ও ব্রজরস-সিদ্ধির গূঢ় গম্ভীর সন্ধান—ব্রজরস-কীর্ত্তন, ব্রজরস-ভাবনা, ব্রজরসানু-ধ্যান ও ব্রজরসে তন্ময়ত্ব—এ লীলার পুষ্টিসাধক। ব্রজবিহারিণী শ্রীমতীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণ-বিরহ-যাতনায় দিন-রজনী ব্যাকুল, সেই অবস্থায় স্বরূপ ও রামানন্দ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। সে সেবা কিরূপ, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, যথা :—

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-যাতনায় প্রভু রাখে নিজ প্রাণ॥"

ফলতঃ ব্রজরস-কীর্ত্তনই ইঁহাদের সেবার মুখ্য অঙ্গ, যথা :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥"

গম্ভীরা-লীলার রসাস্বাদনের পক্ষে এই রসগীতি সমূহের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এই সুধা-গীতি সমূহই এই দীনজনের অসঙ্গ অনিদ্র রজনীর চির-সম্বল। নিদ্রা যে আমায় ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। কেননা উহা আমার নিজেরই প্রার্থিত। গম্ভীরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা স্মরণ করিয়া মনে হইত,—আমার প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ছট্‌ফট করিতেছেন, তাঁহার নয়নে ঘুম নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই, আর আমি কি-না সুখশয্যায় দেহ ঢালিয়া দিয়া ঘুমাইব?

এই মনে করিয়া অপরাধীর ন্যায় শয্যাত্যাগ করিতাম, আলো জ্বালিয়া গম্ভীরার কথা ভাবিতাম, কিয়ৎক্ষণ পরে যেন ভাব-ব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবচ্ছবির আভাস হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত, মনে হইত তিনি যেন আমার সম্মুখে। তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহার সান্ত্বনার জন্য এই গীতি-কাব্যসমূহের কোন কোনখানি হইতে বাছিয়া বাছিয়া পদাবলী পাঠ করিতাম, পড়িতে পড়িতে আনন্দে বিভোর হইতাম,—সে যে কি আনন্দ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার শক্তি আমার নাই,—কিছুতেই সে

আনন্দের তুলনা মিলে না। মনে হইত যেন গম্ভীরার ভিতরে প্রভু; আর আমি গম্ভীরার দ্বারে। এ সুখের স্বপন অধিকক্ষণ থাকিত না। পরক্ষণেই আমি যে একা,—সেই একা।

এই ভাবে যে সকল পদ আমার চিহ্নিত পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট চির মধুর ও চিররসময়—যেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপানির্ম্মাল্য। উহারা এ দীনের হৃদয়ের ভূষণ,—কণ্ঠের ভূষণ ও মস্তকের ভূষণ। এই সকল পদে এ ক্ষুদ্রলেখকের যে সুখের বা দুঃখের ভাব বিজড়িত, তাহা প্রকাশ করার প্রয়াস পাওয়াও বৃথা। আমার কোন কোন প্রিয়সুহৃদের আদেশে ও অনুরোধে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গম্ভীরালীলা আস্বাদনের যৎকিঞ্চিৎ উপযোগী হইতে পারে বলিয়া সেই সকল পদ ও উহাদের ভাবাভাস এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কোন প্রকারে লিপিবদ্ধ হইল। ইহাতে পাছে ভাবুক ও প্রেমিক ভক্তগণের নিকট রস-বিরোধ, রসাভাস প্রভৃতি দোষদুষ্টির জন্য অপরাধী হই, সে আশঙ্কাও যথেষ্ট রহিল।

উপসংহারে ইহাও বক্তব্য,—বৈষ্ণব জগতের পরম হিতৈষী, বৈষ্ণবলেখকসমাজের নিত্য উৎসাহদাতা বহুবৈষ্ণব গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণাদি-ব্যয়-নির্ব্বাহক প্রবীণভক্ত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় মহোদয়ের অর্থব্যয়ে ও একান্ত আগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুরোধ, উদ্যোগ, আগ্রহ, বিশেষত মুদ্রণ-পূর্ব্বেই মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়াদি-সমর্পণ প্রভৃতি ব্যাপারে একবারে বিজড়িত হইয়া আমি এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হই। তাঁহার উদ্যোগ না হইলে এ কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না।

সুতরাং এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কেহ কেহ সন্তুষ্ট হন, তবে তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় মহোদয়কে তাঁহারা যেন প্রীতিপূর্ণ শুভাশীর্ব্বাদ করেন। অপর পক্ষে ইহাতে যে সকল দোষ দৃষ্ট হইবে, তজ্জন্য আমি যেন পাঠক মহোদয়গণের নিন্দারূপ মহাকৃপা লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত না হই, নিবেদন ইতি; শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচরণে মতিরস্তু।

২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

শ্রীনীলাচলে ব্রজ-মাধুরী

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কল্পতরু
অদ্ভুত যাক পরকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমিরবর জ্ঞান
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দধাম।
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥
দুরগতি অগতি অসতমতি যো জন
নাহি সুকৃতি-লব-লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন- যুগল-ভজন-ধন
তাহে করত উপদেশ॥

নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥

২

গোরা পহু করুণাময় অবতার।
যো গুণ-কীর্ত্তনে পতিত দুর্গত জনে
সবজন পাওল নিস্তার ॥
হরি হরি বলি ভুজযুগ তুলি
পুলকে পূরয়ে তনু।
অরুণ দিঠি জলে অবনী ভাসয়ে
সুরধুনী ধারা বহে জনু ॥
গুপত প্রেমধন জগভরি বিলাওল
পূরল সবহুক আশ।
সো প্রেম-সিন্ধু বিন্দু নাহি পাওল
পাসরি গোবিন্দ দাস ॥

৩

দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন এ
মুনিজন-মানস-হংস,
জয় জয় দেব হরে।

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন এ
যদুকুল-নলিন-দিনেশ,
জয় জয় দেব হরে।

মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াশন এ
সুরকুল-কেলি-নিদান,
জয় জয় দেব হরে।

অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন এ
ত্রিভুবন-ভবন-নিদান,
জয় জয় দেব হরে।

জনক-সুতাকৃত-ভূষণ জিত-দূষণ এ
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ,
জয় জয় দেব হরে।

অভিনব জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর এ
শ্রীমুখ-চন্দ্র-চাকোর,
জয় জয় দেব হরে।

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় এ
কুরু কুশলং প্রণতেষু,
জয় জয় দেব হরে।

শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদম্ এ
মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি,
জয় জয় দেব হরে।

———

লীলানুভব

শ্রীভগবানের লীলামাধুরী পরম আনন্দময়ী। তাঁহার কৃপা ভিন্ন লীলার 'অনুভব' হয় না। যোগীরা কত ধ্যান করেন, কিন্তু সকল ধ্যানে ধ্যেয় বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ প্রকাশ পায় না, আপন মনের অলীক কল্পনায় অলীক বস্তু গড়াইয়া তুলিতে হয়, তাহাতে প্রাণের তৃপ্তি হয় না,—এরূপ ধ্যান সুধুই বিড়ম্বনা। এস্থলে অনুভব ভিন্ন উপসনা অসার ও নিস্ফল। যে অনুভবের কথা বলিতেছি, উহা সাক্ষাৎ দর্শনেরই নামান্তর। এরূপ অনুভব না হইলে হৃদয়ের পিপাসা মিটে না। দয়াময়ের লীলা নিত্য। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলেন,—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।"

ইহা প্রকৃতই ঋষিবাক্য। আমি ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমার অভিন্নহৃদয় আত্মারাম এই উক্তির প্রকৃত সাক্ষী। তাঁহার সাক্ষ্যে অপ্রত্যয় করিতে পারি না। তিনি মহাপ্রভুর গম্ভীরা-লীলার নিত্য সেবক। তিনি বলেন, গম্ভীরা লীলা নিত্য, সত্য ও চির মধুর। মহাপ্রভুর দয়ায় এই লীলা অনুভূত হয়—এই অনুভব সাক্ষাৎকারের ন্যায় সুস্পষ্ট। যদিও সর্ব্বত্রই এই লীলার অনুভব হইতে পারে, তথাপি নীলাচলে শ্রীশ্রীগম্ভীরা-মন্দিরের ব্রহ্মরজে বসিয়া এই লীলাঅনুভব করা যেমন সহজ, অন্যত্র তত সহজ ও তত সত্বর সম্ভবপর নহে।

তিনি আরও বলেন, "এখন আমার নিজের প্রত্যক্ষের কথাই শুন—আমি দিন রজনী গম্ভীরা-মন্দিরের আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়াই, তোমাদের মত আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই, অন্য কোন অভিলাষও নাই। রাত্রিতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সেবকগণের সেবারাধনা-শেষ হইলে শ্রীমন্দির একবারেই নীরব হয়। আমি মন্দিরের এক কোণে বসিয়া নীরবে গৌরনাম জপ করি। আমি তোমাদের মত দায়সারা জপ করিতে জানি না। যাঁহার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, আমি বিরহিণীর মত আকুল ভাবে তাঁহাকে ডাকি—না ডাকিয়া থাকিতে পারি না,—তাই ডাকি। দর্শনের পূর্ব্বে এরূপ ডাকেও সান্ত্বনা আছে, সুখ আছে। ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে আশা জাগে—মনে হয় এই তিনি এলেন বুঝি,—

"পরে পাতার উপর পাত।
বুঝি এলেন প্রাণনাথ।"

চমকিত হইয়া মুদিত আঁখি মেলিয়া ফেলি, চাহিয়া দেখি কোথাও কিছুই নাই,—এখনও আসেন নাই। কি নিষ্ঠুর! এত মধুর এত নিঠুর কেন? আমি কিছুই চাইব না, কেবল তাঁকে একটুকু দেখিব—এক কোণে থে'কে দেখিব, আমার লীলাময়ের লীলা দেখিব, আর কাণ পাতিয়া স্বরূপের রুনু ঝুনু স্বরে মধুর লীলা গান শুনিব,—এই আশায় সকল ত্যাগ করিয়া উচ্ছিষ্ট লোভী কুকুরের ন্যায় তৃষিতনেত্রে এখানে পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার নাম করি। কই, তিনি এখনও ত দেখা দিলেন না। এখানেই আছেন তাহা বুঝি! কিন্তু কেবল প্রকাশের অপেক্ষা। আবার

নাম করি অর্থাৎ আকুলভাবে তাঁহাকে ডাকি—এস গৌর দয়াময়, এস আমার প্রাণের ঠাকুর, এস আমার চির-সুন্দর,—এস রস-মাধুর্য্যের অনন্ত খনি !

কত আবেগ, কত উৎকণ্ঠা লইয়া প্রতীক্ষা করি—আশার পরে আশা সাগর-লহরের ন্যায় হৃদয়ে আসিয়া ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু সে তরঙ্গ হৃদয় ছাড়িয়া যায় না। ফলতঃ তাঁহাকে যত নিঠুর বলি, তিনি তত নিঠুর নহেন। তাঁহার নিঠুরতাও একটি লীলা,—কেবল আবেগ, উৎকণ্ঠা ও অনুরাগ বৃদ্ধি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মন তাহা মানে না, আকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু দয়াময় কখনও ভক্তের হৃদয় ভাঙ্গেন না। যখনই নিরাশায় অন্ধকার দেখি, তখনই সম্মুখে তাঁহার মোহনরূপের কনকচ্ছটা ঝলসিয়া উঠে,—কি সুন্দর! কি মধুর! কি আনন্দ! সহসা গম্ভীরা লীলার অদ্ভুত আবির্ভাবে বিস্মিত ও আনন্দে বিভোর হইয়া আত্মহারা হই।

তুমি এই মহালীলার কথা শুনিতে চাও, কিন্তু ইহা শুনাই-বার বিষয় নয়—জানাইবার বিষয়ও নয়—ইহা চিত্তের ধারণার অতীত। মানুষের ভাষা একবারেই এ লীলা-বর্ণনে অসমর্থ—অযোগ্য; যাহা কেবলই অনুভবের বস্তু, ভাষার সহিত তাহার সম্বন্ধ বড় অল্প। তথাপি তোমায় কিঞ্চিৎ আভাস দিতে প্রয়াস পাইব। হয় ত তাহাতে কিছুই বুঝিবে না। ভাষার শব্দ শুনা এক কথা, আবার তাহার অর্থের অনুভব করা অন্য কথা। জল যে কি বস্তু তাহা যে জানে না,—জল যে দেখে নাই এমন

ব্যক্তির নিকটে "জল" এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিলে জল পদার্থ যে কি. তাহা তাহার অনুভব হয় না।

শ্রীভগবানের আনন্দময়ী লীলার অনুভব করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার কৃপা-প্রসাদ লাভ করা চাই, নচেৎ কেবল ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে সে অনুভব ঘটে না।

তুমি গম্ভীরালীলা-দর্শনের সাধনা করিতে চেষ্টা করিবে। আবিষ্টতাময়ী বাসনার সহিত ভগবৎকৃপাপ্রসাদের যখন যোগ হয়, তখনই লীলা অনুভব হয়। ইহার প্রথম সাধন—আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকা। এইরূপ সাধনায় বাঞ্ছা-কল্পতরু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তখন তোমার অনুভব লাভ হইবে। আমি কেবল তোমার রুচি জন্মাইবার জন্য,—আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য সেই দিব্য অনুভব লাভের জন্য—মধুময়ী আনন্দময়ী গম্ভীরা-লীলার অতি যৎকিঞ্চিৎ তোমায় বলিতেছি।

লীলা-কথা

বৈশাখ মাস। নিশা অবসান হইতে না হইতেই রামানন্দ গম্ভীরায় আসিলেন। আসিয়াই গম্ভীরামন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিলেন, দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন প্রভু নাই, চমকিয়া গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; গোবিন্দ দাসেরও সারা পাইলেন না; চিন্তিত ও বিস্মিত হইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন,—তন্দ্রালসে শঙ্কর পণ্ডিত মন্দিরের উত্তর পূর্ব্বকোণে পড়িয়া রহিয়াছেন।

রামরায় চিত্তের উদ্বেগে শঙ্করকে ডাকিয়া তুলিলেন—শঙ্করের প্রভাতী সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। রায় মহাশয় ব্যস্তভাবে বলিলেন "পণ্ডিত নিদ্রাই কি বড়? প্রভু কোথায়, গোবিন্দই বা কোথায়? তোমায় বিশ্বাস করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ভোর না হইতেই প্রভু কোথা চলিয়া গেলেন! গোবিন্দইবা কোথা?

শঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, "রায় মহাশয়, কোন চিন্তা নাই। প্রভু সমুদ্র-স্নানে গমন করিয়াছেন—গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে। রায় মহাশয়, বলিতে কি, আমার নিদ্রাই সর্ব্বস্ব; এ পোড়া ঘুমের মরণ নাই। মনে ত করি ঘুমাইব না, সারা নিশি জাগিয়া জাগিয়া প্রভুর প্রহরা দিব, তাহার সেবা করিব, কিন্তু সব সময়ে চখের পাতা খুলিয়া রাখিতে পারি না। তবু গত কল্য সারানিশিই একরূপ জাগিয়া ছিলাম।

রাম রায়। কেন, কা'ল কি প্রভুর একবারেই নিদ্রা হয় নাই।

শঙ্কর। আপনারা যখন চলিয়া গেলেন, তখন রাত দেড় প্রহর। আপনারাও চলিয়া গেলন, প্রভু আমাকে ও গোবিন্দকে বলিলেন—"তোমরা মিছেমিছি জাগিবে কেন?—এখন শয়ন কর। জান ত আমার নিদ্রা নাই, এমন উদাস প্রাণে কি স্থির থাকা যায়? আমি আবার তারে ডাকি"—এই বলিয়া আকুলভাবে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে আমার চিরমধুর—আমি তোমা ছাড়া এক পলও থাকিতে পারি না। আমার প্রাণ পলে পলে তোমায় চায়—হে নন্দকুলচন্দ্র, তুমি কোথায়? আমার নয়নের

অঞ্জন,—হৃদয়রঞ্জন—তুমি কোথায় ?” এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় আমাদের যে কি বিপদ্‌, তাহা বুঝিতেই পারেন। গোবিন্দ প্রভুর চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—“দয়াময় ক্ষান্ত হও, আমরা যে আর সইতে পারি না। কি করিয়া তোমায় সান্ত্বনা দিতে হয়, আমরা যে তার কিছুই জানি না।”

প্রভু গদ্‌গদ বাক্যে বলিলেন—“গোবিন্দ তোমরা আমায় কি করিতে বল, তোমাদিগকে ক্লেশ দেওয়া কি আমার সাধ ? আমাকে লইয়া তোমাদের যে যাতনা হইয়াছে, তা কি আমি বুঝিতে পারি না—কিন্তু আমি ত বাউল। ঐ দেখ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, নির্ম্মল নীলাকাশ, মধু-মাধবের স্নিগ্ধ বাতাস, আর ঐ কুসুম-কাননের সুখময় সুবাস,—হায় এ সময়ে আমার প্রাণের প্রাণ চির সুন্দর কোথা ?”

এই বলিতে বলিতে প্রভু উন্মত্তের ন্যায় মন্দিরের বাহির হইলেন, আমি ও গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে বাহির হইলাম—মনে করিলাম,—না-জানি-কি নূতন বিপদ্‌ ঘটে। কিন্তু প্রভু আর কোথাও না যাইয়া আমাদের ফুলবাগানে এক প্রস্তর খণ্ডে ব্যাকুলভাবে একটি বৃক্ষমূলে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া পড়িলেন, উন্মত্তের মত এদিক ওদিকে তাকাইতে লাগিলেন। গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, জাতি যুতি মধুমালতী, বেলী ও চম্পকের গন্ধে চারিদিক আমোদিত।

প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি—আকাশের চাঁদ কোথায়

অঞ্জন,—হৃদয়রঞ্জন—তুমি কোথায় ?" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় আমাদের যে কি বিপদ্, তাহা বুঝিতেই পারেন। গোবিন্দ প্রভুর চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"দয়াময় ক্ষান্ত হও, আমরা যে আর সইতে পারি না। কি করিয়া তোমায় সান্ত্বনা দিতে হয়, আমরা যে তার কিছুই জানি না।"

প্রভু গদ্‌গদ বাক্যে বলিলেন—"গোবিন্দ তোমরা আমায় কি করিতে বল, তোমাদিগকে ক্লেশ দেওয়া কি আমার সাধ ? আমাকে লইয়া তোমাদের যে যাতনা হইয়াছে, তা কি আমি বুঝিতে পারি না—কিন্তু আমি ত বাউল। ঐ দেখ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, নির্ম্মল নীলাকাশ, মধু-মাধবের স্নিগ্ধ বাতাস, আর ঐ কুসুম-কাননের সুখময় সুবাস,—হায় এ সময়ে আমার প্রাণের প্রাণ চির সুন্দর কোথা ?"

এই বলিতে বলিতে প্রভু উন্মত্তের ন্যায় মন্দিরের বাহির হইলেন, আমি ও গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে বাহির হইলাম—মনে করিলাম,—না-জানি-কি নূতন বিপদ্ ঘটে। কিন্তু প্রভু আর কোথাও না যাইয়া আমাদের ফুলবাগানে এক প্রস্তর খণ্ডে ব্যাকুলভাবে একটি বৃক্ষমূলে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া পড়িলেন, উন্মত্তের মত এদিক ওদিকে তাকাইতে লাগিলেন। গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, জাতি যূতি মধুমালতী, বেলী ও চম্পকের গন্ধে চারিদিক আমোদিত।

প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি—আকাশের চাঁদ কোথায়

লাগে, সজল নয়ন হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে, আর ব্যাকুল নয়নে মৃদু মৃদু গদ্‌গদ্‌স্বরে গাইতেছেন :—

দ্বারের আগে ফুলের বাগান
কি সুখ লাগিয়া রুইনু।
মধু খাই খাই ভ্রমরা মাতল
বিরহ-জ্বালাতে মৈনু॥
জাতি রুইনু যুতী রুইনু
রুইনু গন্ধমালতী।
ফুলের সুবাসে নিদ্রা নাহি আসে
কেমন পুরুষ জাতি॥
কুসুম তুলিয়া বোঁটা তেয়াগিয়া
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায়
রসিক নাগর বিনে॥

মৃদুস্বরে বিনাইয়া বিনাই গান গাইতে গাইতে অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন; তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিল না। প্রভু তখন আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "ললিতা আমার একি হইল। এখন আমি কি করি?"—এই বলিতে বলিতে আবার গান ধরিলেন :—

বধুঁর লাগিয়া সেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা॥

সই, পাছে এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলিল কান।
কত আশা করি সব পরি হরি
আইনু গহন বনে।
পথ পানে চাহি কত বা রহিব
কত প্রবোধিব মনে॥

গান শেষ হইতে না হইতেই প্রভু শিলাখণ্ডের উপরে ঢলিয়া পড়িলেন। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি গিয়া মাথার নিকটে বসিলেন, আমিও মহা বিপদ্ মনে গণিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম। বুঝিলাম,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একবারেই লোপ পাইয়াছে।

রায় মহাশয় মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "কি বিপদ্। তারপর?

শঙ্কর। তার পর, আমরা অন্য উপায় না দেখিয়া কেবল "হা কৃষ্ণ দয়াময়, হা কৃষ্ণ দয়াময়" বলিয়া কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলাম। এই ভাবে রাত্রি তিন প্রহর অতীত হইলে প্রভুর জ্ঞানের সঞ্চার দেখিতে পাইলাম, তখনও নয়ন ধারার বিরাম নাই। গোবিন্দ কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে বলিলেন,—"দয়াময় এই কঠিন কঙ্করময় শিলার উপরে শ্রীঅঙ্গ পতিত দেখিয়া আমাদের প্রাণ অধীর হইতেছে। এখন উঠুন।"

প্রভু মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "গোবিন্দ, আমি আমাতে নাই, কিন্তু আমি যে তোমাদের ক্লেশের কারণ হইয়া পড়িলাম, আমার এ দুঃখ রাখার স্থান নাই। কৃষ্ণ আমায় এ কি করিলেন?"

২

এই বলিয়া প্রভু আস্তে আস্তে দাঁড়াইলেন। আমরা তাঁহাকে ধরিয়া শ্রীমন্দিরে আনিয়া শয়ন করাইলাম। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া গোবিন্দকে বলিলেন, "গোবিন্দ তুমি এখনও বসিয়া আছ ? একটু শয়ন কর, আমি সমুদ্র স্নানে যাইতেছি।"

গোবিন্দ বলিলেন—"আমি আজ অরুণোদয়ে সমুদ্র-স্নান করিব।" এই বলিয়া উভয়ে সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। আর আমি অলস নিদ্রালু,—তন্দ্রালসে এখানে পড়িয়া রহিয়াছি! আপনার আগমন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। প্রভুর পদতলে পড়িয়া থাকি, আর পদ সেবা করিতে করিতেই ঘুমাইয়া পড়ি। আমি অপরাধী। আমায় ক্ষমা করিবেন।"

রামরায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমাকে জাগাইয়া কাজ ভাল করি নাই। তুমি সারানিশি জাগিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছ। আমি বিষয়ী অধম, সে সৌভাগ্য ত আমার নাই। আমরা বহিরঙ্গ। তুমিই প্রভুর আপন জন; তাই তোমার উপরে এত জোড়ে কথা বলি।"

এই সময় শ্রীপাদ স্বরূপ আগমন করিয়া বলিলেন—"রায় মহাশয়, এত প্রত্যুষে কেন ?"

রামরায় শ্রীপাদ স্বরূপকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "রাত্রিকালে প্রভুর আদেশে ঘরে গিয়াও স্থির থাকিতে পারিলাম না, সততই হৃদয়ের উদ্বেগ। ক্রমেই প্রভুর চিত্ত এত অধীর হইয়া পড়িতেছে, কখন যে কি অবস্থা ঘটে বলা যায় না।

শঙ্কর পণ্ডিতের নিকট গত রাত্রির ঘটনার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, এই জন্যই বুঝিবা রাত্রিতে প্রাণ এমন আনচান করিতেছিল, তাই ঘরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া প্রভাতেই এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

এই বলিয়া রামরায় শ্রীপাদ স্বরূপের নিকট রাত্রির ঘটনা বিবরিয়া প্রকাশ করিলেন। স্বরূপ কাণ পাতিয়া শুনিলেন, কিন্তু বিস্ময়ের ভাব না দেখাইয়া বলিলেন—"এখন এইরূপই হবে। রাধা প্রেমের মহিমা যমুনার তটে কুসুম-কুঞ্জে এক ভাবে দেখা গিয়াছে,—এবার নীলাম্বুধিতটে তাহারই ঘনসার আস্বাদিত হইবে। মহাপ্রভু শ্রীমতীর ঋণে ঋণী,—অপর কথায় তিনি দাতা শিরোমণি। কেবল চোর ধরা পড়িয়াছি আমি,—আর তুমি। যত ঢাকাঢাকি যত বাধাবাধি, আর যত লুকোচুরি তা কেবল আমার বেলায় আর তোমার বেলায়। উনি স্বয়ং যা ইচ্ছা, তাই করিবেন আর আমরা আমাদের ভাব প্রকাশ করিতে পারিব না—বল দেখি একি ব্যবস্থা ?"

রামরায় বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুপ করুন, ঐ বুঝি প্রভুর আগমন হচ্ছে।"

শিশিরস্নাত শুভ্রকুসুমের ন্যায় গৌরচন্দ্র গম্ভীরা-মন্দিরে পদার্পণ করিলেন। স্বরূপ ও রামরায় প্রণত হইলেন। প্রভুর নয়ন-কোণ আরক্তিম, নয়ন-যুগল তখনও অশ্রুপূর্ণ, মণিমুক্তার মোহন মালার ন্যায় অশ্রুবিন্দুতে তখনও তাঁহার গণ্ডদেশ পরিপ্লুত হইতেছিল।

গোবিন্দ তাঁহার বদন ধৌত করিয়া দিলেন। প্রভু অবশ ভাবে

মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন।

স্বরূপ ভাব বুঝিয়া আপন মনে গুন্‌গুন স্বরে গান ধরিলেন,—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥
নিজ করোপরে রাখিয়ে কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মাসেরি ধারা॥

এই টুকু গাইয়া স্বরূপ নীরব হইলেন, রামরায় বলিলেন বাকীটুকু কাহার জন্য রাহল? এত লজ্জাই বা কি?

রায় মহাশয় ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন :—

হেনকালে তথা আইল ললিতা
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া
তুলিয়া লইলা কোরে॥
নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেন ধনী হয়েছ এমনি
কহ বা কি লাগি শুনি॥

সদা মন সুখে হাসি বিধুমুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥
চণ্ডীদাস বলে এ সব জানিলে
চাতুরী-রসের সার।
রসিক হইলে জানিতে পারয়ে
কিবা সে-যে রস-ধার ॥

গোরাশশী স্বরূপের দিকে চাহিয়া সজলনয়নে অতি ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—"স্বরূপ, আমার বলবুদ্ধি এখন সবই তোমরা। আমি আর আমাতে নাই। যতক্ষণ তোমাদের নিকট কৃষ্ণকথা শুনি, ততক্ষণ একরূপ কাটিয়া যায়, তারপরে যে আমার কি দশা হয়, বলিতে পারি না। গত রাত্রিতে আমাকে লইয়া শঙ্কর ও গোবিন্দ কি যাতনাই না পাইয়াছে? পূর্ব্বে ভক্তগণ-সঙ্গে নাম-কীর্ত্তনে কত আনন্দ পাইতাম, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াই বা কত সুখ পাইতাম,—এখন দেহ একবারেই অবশ, কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না—মনে হয় বিরলে বসিয়া কেবলই সেই শ্যাম সুন্দরের ভাবনা করি। তুমি কাল সাঁজের বেলায় চণ্ডীদাসের যে পদটী গাহিয়াছিলে সে গানটী কি মধুর—

রাধার কি হ'লো অন্তর ব্যথা।
বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা ॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পড়ে
যেমন যোগিনীর পারা॥

স্বরূপ, প্রকৃত কথা এই যে যার ব্যথা সেই জানে—শ্রীরাধার অন্তরের ব্যথা, শ্রীরাধাই জানেন—তিনি শ্যাম-বিরহে এক তিলও স্থির থাকিতে পারেন না—তিলে তিলে তাহাকে "ঘর বাহির" হইতে হয়—প্রাণ-বন্ধুর দর্শন লালসায় প্রাণ এমনই উচাটন! আমিই কি ঘরে থাকিতে পারি? তোমরা আমায় বুঝাইয়া ঘরে রাখিতে চাও, কিন্তু আমার প্রাণ অস্থির; গৃহ আমার নিকট কারাগার বলিয়া মনে হয়। কেবল ভাবি—কোথা গেলে তাকে পাব?

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া কাঁপয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥

এ যাতনা যার হয়, সেও কি কখন স্থির থাকিতে পারে?—সে সুন্দর, সে মন-চোরা—সে মধুরমুরলীধর—এমন করিয়াই প্রাণে দাগা দেয়!

প্রাণের স্বরূপ—তুমি এই যে এখনি সেই নিঠুরের নাম করিলে! উহার নাম শুনিলেই আমার চিত্ত আকুল হইয়া উঠে—হায় এখন আমার উপায় কি?

এই বলিয়া মহাপ্রভু কথা কহিতে কহিতে সহসা স্তম্ভিত,

নীরব ও বিবশ হইয়া পড়িলেন। স্বরূপ ভাব বুঝিয়া গাইলেন :—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাশরিত চাহি মনে পাশরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল-নাশে
আপনার যৌবন যাচয়॥

প্রভু বাস্প-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"স্বরূপ এ পদ তো আমি আরও শুনিয়াছি, কিন্তু আজ মনে হইতেছে যেন তোমার মুখে এমন মধুর গান আর কখনও শুনি নাই—স্বরূপ, শ্যাম নামের কি এতই শক্তি"—বলিতে বলিতেই প্রভুর কণ্ঠ স্তম্ভিত হইল—তিনি একবারে নীরব হইলেন, নয়ন ধারায় বুক ভিজিয়া গেল।

রামরায় প্রভুর ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন,—দেখিতে পাইলেন তাঁহার সুচিক্কণ বিম্বোষ্ঠযুগল বাতাহত বংশ-পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে—আর তিনি অবিরল শ্যাম-নাম জপ করিতেছেন—আর এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে একবারে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল।

উষার প্রথম অরুণ-কিরণে জাগরিত বিহগ-কাকলীর ন্যায় সহসা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এক সুধা-সঙ্গীতের কলধ্বনি মৃদু স্বরে ফুটিয়া উঠিল—

হাম সে অবলা হৃদয়ে অবলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালো আনি॥
হরি হরি, কেন বা এমন হলো।
বিষম বাড়ব অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়সে কিশোর রূপ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ॥

আবার নীরব—নয়নে অশ্রুপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল, ঈষৎ বিস্ফারিত, ও আনন্দব্যঞ্জক। স্বরূপ ও রামরায় চকোরের ন্যায় প্রভুর

মুখচন্দ্র দর্শন করিতেছেন। প্রভুর শ্রীমুখ-মণ্ডলে যেন আনন্দ-সুধা উছলিয়া উঠিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে গীতি-সুধার মৃদু উৎস আবার ফুটিয়া উঠিল:—

নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা.পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে সে না ছাড়ে চিতে
এখন করিব কি !

মুখের গান গদ্‌গদ ভাবে শেষ হইতে না হইতেই প্রভু নয়ন মুদিয়া নীরব হইলেন। স্বরূপের ও রামরায়ের হৃদয় সে ঝঙ্কারের তরঙ্গে পূর্ণ হইয়া গেল। স্বরূপ তখন অতর্কিত ভাবে গানের তান ধরিয়া পদ পূরণ করিলেন—

কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নব-রসে
ঠেকিলে রাজার ঝি ॥

মহাভাবমগ্ন মহাপ্রভুর এইরূপ অন্তর্দ্দশায় ভক্তগণ অতি নীরবে তাঁহার নিকটে থাকিয়া সময়-উপযোগিসেবা করিতেন। স্বরূপ প্রভুর পাদুখানি নিজের কোলে লইয়া পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন, গোবিন্দ ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন। রামরায়ের কোলে মস্তক রাখিয়া প্রভু একবার মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। কখন কখন তাঁহার ওষ্ঠ-স্পন্দন হইতে ছিল—ললাট-দেশে মুক্তার মোহন বিন্দুর ন্যায় স্বেদ-বিন্দু সকল শোভা পাইতে লাগিল। আর

এক একবার "শ্যাম! শ্যাম হে,—আমার প্রাণবল্লভ হে" বলিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ছিলেন।

এই ভাবে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইল। গোবিন্দ দাস ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—রায় মহাশয়, প্রভু আপনাদের সঙ্গ ছাড়া থাকিতে পারেন না—কিন্তু সঙ্গের তো এই দশা।"

গোবিন্দের কথা শেষ হইতে না হইতেই স্বরূপ বলিলেন গত রাত্রিতে তো আমরা ছিলাম না,—তবে এমন হলো কেন! গোবিন্দ বলিলেন—"আমি একবারেই এ সকল সইতে পারি না। এই তো দেখুন—বেলা প্রায় দুপ্রহর, এখনও প্রভুর সেবার কিছুই করিতে পারিলাম না। আমি আপনাদের গানও বুঝি না—কৃষ্ণ-কথাও বুঝি না। আমি বুঝি কেবল—প্রভুর সেবা। সে সুবিধা না পাইলে আমার অসহ্য যাতনা হয়। তিনি হয়ত আপনভাবে বিভল থাকেন,—কিন্তু আমি চাই—উহার হাসিমাখা চাঁদবদনখানি দেখিতে,—আমি চাই উহার সেবা করিতে! আপনাদের কৃষ্ণ-কথায়, আপনাদের গানে যখন উহার শ্রীমুখখানি নয়ন-জলে ভাসিয়া যায়—তাহা দেখিতে আমার বড় ক্লেশ হয়—যখন উনি ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়েন—তখন আমার বলবুদ্ধি লোপ পায়—আমি পাগলের ন্যায় হইয়া পড়ি। এই দেখুন--উনি কিরূপভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন—এ যাতনা কি চ'খে দেখা যায়?"

স্বরূপ সমদুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"যথার্থই গোবিন্দ, এ দশা দেখিয়া কাহার না ক্লেশ হয়? জানতো উনি স্বেচ্ছাময় লীলাময়—রসময় ও দয়াময়। লীলাময়ের এই লীলা জীবের

হিতের জন্য! জীবের হিতের জন্যই উনি অবতীর্ণ। উনি এই ভাবেই জীবদিগকে কৃষ্ণপ্রেমের আভাস দিতেছেন। গোবিন্দ, ভাবনিধি গৌরশশীর ভাব,—অপার, অনন্ত। আরও কত কিছু দেখিতে পাইবে। শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা জীবতো কখনও জানিতে পারে নাই, প্রভু নিজে তাহা আস্বাদন করিয়া প্রেমিক ভক্তগণকে কৃপা-প্রসাদ দান করিবেন। কেবল কি তাই—উহার নিজের প্রেমানন্দ-মাধুরী কেমন, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানুভবে শ্রীরাধার সুখ-সুধাই বা কত মধুর,—প্রভু নিজে আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে তাহার কিঞ্চিৎ কণালেশ প্রদান করিবেন—ভাবনিধি প্রেমময় প্রভুর ভাব-তরঙ্গের কি অবধি আছে? এখনই এত উতালা হইলে চলিবে কেন?"

গোবিন্দ বিস্মিতের ন্যায় শ্রীপাদ স্বরূপের কথা শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিলেন। গোবিন্দের কাণে এ সকল কথা ভাল লাগে না। জীবের জন্য প্রভুকে এত যাতনা সহিতে হইবে, এত বিরহ-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে আর তিনি অনাহারে অনিদ্রায় যেখানে-সেখানে ধূলায় গড়াগড়ি দিবেন—মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিবেন—গোবিন্দের প্রাণে এ বেদনা সহিবে না। গোবিন্দ বুঝেন—প্রভুর সেবা। তিনি আর কিছু জানেন না—আর কোন উদ্দেশ্যও বুঝেন না। তাই গোবিন্দ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—"স্বরূপ ঠাকুর, তোমার ও সকল কথা আমি বুঝি না, তুমি আমার প্রভুকে জাগাইয়া দেও। কাল সারারাতের মধ্যে জলস্পর্শ করেন নাই—আজও বেলা দুপ্রহর অতীত হইয়া গেল—একটুকু

জল মুখে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। তোমরা না থাকিলে এখন এতটা হইত না।”

স্বরূপ গোবিন্দের সরল কথায় বাস্তবিক কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া কাতর কণ্ঠে আবার গান ধরিলেন :—

শ্যামর সুন্দর এ বাটে আএল
তেঁ মোরি লাগল আঁখি।
আরতি আঁচর সাজি না ভেলে
সবে সখীজন সাখী॥
কহ হি মো সখি কহ হি মো
কতএ তাহারি বাসা।
দূরহ দুগুণ এড়ি মঞে আবও
পুন দরশন আশা॥
কি মোরা জীবনে কি মোরা যৌবনে
কি মোরা চতুরাপনে।
মদন বানে মুরছিলা অছঞো
সহঞো জীব অপনে॥
আধপদে যো ধরতে মোর দেখ
নাগর-জন-সমাজে।
কঠিন হৃদয় ভেদি না ভেলে
যাঁও রসাতল লাজে॥
সুরপতি পাএ লোচন মাগঞো
গরুড় মাগঞো পাখী।

নন্দেরি নন্দন মঞে দেখি আবঞো
মন মনোরথ রাখি ॥*

স্বরূপের এক গানে মহাপ্রভু ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন—এ গানে আবার ধীরে ধীরে চেতনা পাইলেন, স্বরূপের মুখের দিকে চাহিয়া একটুকু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—স্বরূপ তুমি যখন গান কর, আমার মনে হয় উহা যেন গান নয়,—যেন মূর্ত্তিমতী ব্রজলীলা। যত শুনি ততই শুনিতে সাধ হয়। কিছুতেই কাণের পিপাসা মিটে না।"

গোবিন্দ দাস স্বরূপকে চ'খের ইঙ্গিতে বুঝাইলেন, স্বরূপ যেন

---

* এটি বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদ। ইহার ভাবার্থ এইরূপ—

সখি, আমার দোষ কি! শ্যাম সুন্দর এ পথে এলো, তাই তার রূপ আমার নয়নে লাগল। তাহার দিকে চাইতে গিয়া জ্ঞান হারাইলাম, আঁচল দিয়া অঙ্গ আবরণ করার সময় পাইলাম না। তোমরা আমার সে অবস্থা দেখেছ তো! সখি আমায় বল,ওগো সখি আমায় বল,—সে কোথায় থাকে। দুগুণ দূর হইলেও আমি একবার সেখানে যাব, যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিব। সখি, যদি তাকে না পাই, তবে আমার এ জীবনে ফল কি, যোগ-বলেই বা ফল কি, আমার চতুরপণাতেই বা ফল কি? আমি মদন-বাণে পুড়িয়া মরিতেছি,—কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আর এক পা বাড়াইয়া দিতেই সে আমায় চতুর লোক সমাজের মধ্যে দেখিয়া ফেলিল। এখন বল উপায় কি? আমার কঠিন হৃদয় কেন বিদীর্ণ হয় না—হায় লজ্জাও যে রসাতলে গেল। সহস্রলোচন আমায় সহস্র লোচন দিন, গরুড় আমায় পাখা দিন, মনোরথে মন রাখিয়া আমি নন্দের নন্দনকে একবার দেখিয়া আসি।

আর গান না করেন। বলা বাহুল্য মহাপ্রভু আদেশ করিলেও স্বরূপ এই সময়ে সে আদেশ পালন করিলেন না।

রায় মহাশয় বলিলেন—গোবিন্দ, প্রভুর প্রসাদ না পাইলে আমরা উঠিব না। গোবিন্দ ইতোমধ্যে ভোগ-আরাধনার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রিয় পার্ষদগণকে লইয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ধ্বনি করিয়া সেবা গ্রহণ করিলেন। সকলের শেষে গোবিন্দ পাত্র-শেষ লইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। ভোগারাধনার পরে রামরায় বলিলেন—"দয়াময় এখন একটু বিশ্রাম করুন, শ্রীমুখখানি কেমন পাণ্ডুর দেখাইতেছে।"

প্রভু। আমার বিশ্রামের ভার তোমাদের উপরে। তোমাদের শ্রমেই আমার বিশ্রাম। যতক্ষণ তোমরা আমার কৃষ্ণকথা শুনাও, ততক্ষণই আমার বিশ্রাম। তা ভিন্ন আমার শান্তি নাই।

রামরায়। আপনার লীলা-রহস্য আপনিই জানেন। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

প্রভু। রামরায়, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ খানির রস-সুধা আস্বাদন করিয়াছ তো। তোমার মুখে উহার মর্ম্ম শুনিতে আমার বড় সাধ। উহা হইতে কৃষ্ণকথা বলিয়া আজ আমায় বিশ্রাম দাও।

রামরায়। দয়াময়—আপনার কৃপা-প্রসাদে শ্রীগ্রন্থখানি নয়ন-গোচর হইয়াছে। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমন সুধা-নিধি আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। সকলই আপনার কৃপা। গ্রন্থকার যেন মদন-মনোহর সুমধুর শ্যামসুন্দরের লীলামাধুর্য্য-সিন্ধুতে ডুবিয়া ডুবিয়া মাধুর্য্য-রত্ন ইহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

এমন সুন্দর মধুরোজ্জ্বল গ্রন্থ আর কখনও দেখার সৌভাগ্য হয় নাই।

প্রভু। গ্রন্থকার লীলাশুক মধুরা-রতির অধিকারী। মধুরা রতির অনুরাগে বিভোর থাকিয়া তিনি মধুময় শ্রীভগবানের যে লীলা-দর্শন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তোমাদের ন্যায় প্রেমিক ভক্তগণই এই গ্রন্থ রসাস্বাদনের অধিকারী। আজ তোমার নিকট আমি উহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। আমার আর অপেক্ষা সহিতেছে না।

রামরায়। হৃদয়েশ্বর, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যাহা বলাইবে তাহাই বলিব। তুমি বক্তা, তুমিই শ্রোতা। তুমি ছাড়া আমার আর আপন বলিবার কিছুই নাই।

এই বলিয়া রামরায় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-নখরের দিকে দৃষ্টি করিয়া কিয়ৎক্ষণ যেন ধ্যানস্থ হইলেন—তাঁহার নয়ন-কোণে জলবিন্দু দেখা দিল—অবশেষে তিনি বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে অতি সুললিত স্বরে কৃষ্ণ কর্ণামৃতের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন ঃ—

"কমণীয়-কিশোর মূর্ত্তেঃ।
কলবেণু-ক্বণিতাদৃতাননেন্দোঃ॥
মম বাচি বিজৃম্ভতাং মুরারেঃ।
মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি॥"

মহাপ্রভু হর্ষপ্রফুল্ল মুখে বলিলেন—"আমি মনে করিতে ছিলাম—তুমি প্রথমতঃ ঠিক্ এই পদটাই আমায় শুনাইবে।

প্রেমময়ের মধুর লীলা-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া লীলাশুক যে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। লীলাশুক বলিতেছেন—"মুরারি-মাধুরীর কোন কণিকা মাত্রও যেন আমার বাক্যে প্রকাশ পায়।"

"প্রেমিক ভক্ত-হৃদয়ে মধুময় মাধবের মাধুর্য্য-সিন্ধুর স্ফুর্ত্তি কেমন উজ্জ্বল ও বিশাল একবার ভাবিয়া দেখ। লীলাশুক বলিতেছেন—যিনি মুরারি, —তিনিই মধুরিমা। লোকে যাহাকে মুরারি বলিয়া জানে, লীলাশুক শ্রীরাধিকা ভাবের আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকেই সাক্ষাৎ মধুরিমা বলিয়া জানিয়াছেন। তাঁহার নয়ন-সমক্ষে যেন এক অগাধ অনন্ত মাধুর্য্য-সিন্ধু লীলা-তরঙ্গ-রঙ্গে বিরাজ করিতে-ছেন—আর তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া সেই মাধুর্য্য লীলাসুধা দর্শন করিতেছেন। আর বলিতেছেন,—"হে অনন্ত বিশাল মাধুর্য্য-সিন্ধো,— আমার এই ক্ষুদ্র রসনায় তোমার মাধুরী লীলার কণামাত্রও যদি প্রকাশ পায়, আমি কৃতার্থ হইব। তোমার মাধুর্য্যের এক কণামাত্রও মাধুর্য্য-রসে ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া রাখিতে পারে।

"হে মহামাধুর্য্য-সিন্ধো—লোকে তোমায় মুরারি বলে। বাস্তবিকই তুমি মুরারি—কিন্তু মুরদৈত্য নিহত হইয়াছে বলিয়া আমি তোমায় মুরারি বলি না। মুর দৈত্য-নিধন—তোমার বিষ্ণু শক্তির কর্ম্ম। তুমি মুরার অরি—কুৎসার অরি। কোন কুৎসাই তোমায় নাই—তুমি সর্ব্ব কুৎসাবিহীন—হে চিরসুন্দর, তুমি সর্ব্ব সুন্দর—তুমি পরম সুন্দর। তুমি মধুর—চির মধুর। তুমি—"কমনীয়-কিশোরমুগ্ধমুর্ত্তি।"

রামরায়—বুঝিতে পেরেছ তো—এ কাব্য-কল্পনার ভাষা নয়—সাক্ষাৎ সন্দর্শনের ভাষা—যে রূপের ভাবনায় আমার হৃদয় সর্ব্বদা আমাকে ব্যাকুল করিয়া রাখে—ইহা সেই রূপের দেখা কথা—মধুর উজ্জ্বল সুন্দর ও মনোহর! বলিতে বলিতে মহাপ্রভু সহসা নীরব হইয়া পড়িলেন—উত্তাল নয়নে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন—সে দৃষ্টি একবারেই জগৎ ছাড়া—তাঁহার নয়ন-সমক্ষে যেন বিশাল লীলা-মাধুর্য্যের সুধাসিন্ধু;—আর তিনি যেন অনিমিষ নেত্রে ঢোকে ঢোকে সেই সুধা পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন। প্রভুর বিবশ ভাব দেখিয়া স্বরূপ তাঁহার পশ্চাৎ দিকে গিয়া বসিলেন—পাছে বা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া হঠাৎ পড়িয়া যান। স্বরূপ ধীরে ধীরে প্রভুর অবশ মস্তক আপন স্কন্ধে স্থাপন করিলেন—তখনও তাঁহার দৃষ্টি ও ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল—তিনি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দিতে লাগিলেন—বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল—বলিলেন "রামরায়—আমি পাগল—কি বলিতে কি বলি,—কি করিতে কি করি—কিছুই ঠিক নাই। কি যেন বলিতে ছিলাম—কি যেন বলা হয় নাই—বলিতে বলিতে সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। হাঁ হাঁ সেই মুখশশীর কথা—সেই মুরলীবদনের কথা—"কল-বেণু-ক্বণিতা-দৃত" মুখশশী!—না শুনিলে বুঝিবে না—সেই কলবেণুক্বণিত কি মধুর—আর না দেখিলেও বুঝিবে না—সেই কলবেণুক্বণিত-সুধা সেবিত শ্রীমুখের কি কমনীয় মাধুর্য্য! রামরায়—নিশ্চয় জানিও এই মাধুর্য্য-আস্বাদন—লীলাশুকের একেবারেই প্রত্যক্ষ।

৩

লীলাশুক মধুর রতির সাধক—মধুর ভাবের আশ্রয়ী। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণের কেবল মধুর রূপের আনন্দরসে তিনি বিভোর থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী সমুদ্রের ন্যায় অসীম ও অনন্ত গম্ভীর। তাঁহার হৃদয় সেই অনন্ত মাধুরীতে নিমগ্ন। তাঁহার ভাব স্তম্ভিত, ভাষা একবারেই বিহ্বল। অথচ সেই চিরমাধুর্য্যময় ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরের রূপের কথা প্রিয়জনকে যেন না বলিলেই নয়—তাই ব্যাকুল ভাবে বলিতেছেন—"সেই কমনীয় কিশোর মূর্ত্তি কলবেণু-ক্বণিতপূর্ণ শ্রীমুখ-চন্দ্রের কথা আমি কেমন করিয়া বলিব—আমি মুরারির সেই মোহন মাধুরীর কথা বলিতে ভাষা পাই না—মাধুর্য্য-সাগর-মুরারির অনন্ত মাধুর্য্যের কণিকা মাত্রও যেন আমার বাক্যে প্রকাশ পায়।"

রামরায়, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থখানি প্রকৃতই অমৃতের খনি। সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে এমন বর্ণনা হয় না। কোন্ পদ্যটী ছাড়িয়া কোন্ পদ্যটি পড়িব—আগে কোন্‌টির রসাস্বাদন করিব—পরেই বা কোন্‌টির কথা বলিব—তাহার নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি না। অমর কবি শ্রীল বিল্বমঙ্গল-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থখানি সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে অলৌকিক কাব্য। যে রসে প্রেমিক ভক্তের প্রাণ সুশীতল হয়, আধ্যাত্মিকতায় চিত্ত পরিপুষ্ট হয়, যে রস নিত্যানন্দময় ধামে নিয়ত সঞ্চারিত ও প্রবাহিত হইয়া প্রেম-ময়কে শ্রীব্রজ-সুন্দরীগণের নিকট নবনবায়মান করিয়া দেয়—সেই বিশুদ্ধ মাধুর্য্য-রসে এই কাব্য বিরচিত। ইহার ভাব

যেমন সমুচ্চ, তেমনই ব্রজরসসুধাময়—ভাষাও তেমনি লালিত্য-ময়ী। ইহা পাঠ করিলে ইতর রাগ দূরে যায়—চিত্ত এক অনির্ব্বচনীয় অতি সুন্দর মাধুর্য্যময় ও নিত্যাকর্ষণগুণময় শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দরের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়।*

---

* শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ-দেশে ভ্রমণ-কালে এই গ্রন্থের সন্ধান পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য এই পুথি আনয়ন করেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে—

তবে প্রভু আইলা কৃষ্ণ-বেন্বাতীরে।
নানা তীর্থে দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব-চরিত।
বৈষ্ণব সকলে পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমাজ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুথি পাইঞা।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥

বঙ্গদেশীয় ভক্তগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় এই মহারত্ন দর্শন করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং এই শ্রীগ্রন্থখানি মহাপ্রভুরই কৃপাদান। তিনি স্বয়ং ও জীব-শিক্ষার জন্য যে নিরবধি এই গ্রন্থ রসের আস্বাদন করিতেন তাহার প্রমাণ বহুবার প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীগৌর সুন্দরের পার্ষদগণের মধ্যে সকলেই এই গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবনের রস-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরায় রামানন্দকে মহাপ্রভু বিশেষ আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিতে দিয়াছিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

তোমার কথায় সান্ধ্য আকাশের তারার মত কর্ণামৃতের বিবিধ পদ্য আমার স্মরণ হইতেছে। এই শুন আর একটি :—

বর্হোত্তংস-বিলাস-কুন্তলভরং মাধুর্য্যমগ্নানম্

প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্বেণুপ্রণাদামৃতম্।

আপীনস্তনকুট্মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং

জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তি জগতামেকাভিরামাদ্ভুতম্॥

তীর্থ-যাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।

কর্ণামৃত ব্রহ্ম সংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥

রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।

প্রভু সহ আস্বাদিলা রাখিলা লিখিয়া॥

ফলতঃ এই গ্রন্থখানি কেবল পাঠের পুস্তক নহে—উহা নিরন্তর আস্বাদনের অমৃতময় মহাসামগ্রী বা ঘনীভূত রস। কিন্তু গুরূপদেশ ভিন্ন এই গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ সাহিত্য-রসিক পাঠকগণের হৃদয়ে ইহার পদ-লালিত্যে এবং ক্বচিৎ ক্বচিৎ উচ্চতম ভাবের যৎকিঞ্চিৎ স্ফুরণেই তাঁহারা চরিতার্থ হইয়া শত মুখে এই কাব্যের গুণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ইহার প্রকৃত রস অতি গভীর ভাবের অন্তরালে অন্তর্নিহিত। সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে তাহা একবারেই দুর্ল্লভ। কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় এই গ্রন্থের যে রসময়ী টীকা করিয়াছেন—তাহা আন্তরিক ভাবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপা শক্তির পরিচায়ক—উহা প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে বাস্তবিকই সঞ্জীবনী-সুধা। শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামি মহোদয়কৃত এই গ্রন্থের এক আরও একখানি টীকা দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর মহাশয়, কবিরাজ গোস্বামীর টীকা অবলম্বনে যে বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহাও উত্তম। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় উক্ত পদ্যানুবাদও জন-সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়

লীলাশুক বলিতেছেন—"অনন্ত জগতের এক অভিরাম অদ্ভুত জ্যোতিঃ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। ইহাঁর মস্তকে চাঁচর চিক্কণ কুন্তল-ভার, সেই কেশদাম মোহন চূড়ায় শোভিত, চূড়ায় ভুবনমোহন শিখিপুচ্ছ। মুখখানি অনন্ত মাধুর্য্যের নিলয়,—যেন জগতের সমস্ত মাধুর্য্য ঐ শ্রীমুখে ডুবিয়া রহিয়াছে,—অথবা কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ড-মাধুর্য্যে ও ঈষৎ হাস্যমাখা অধরের মাধুর্য্য-প্রবাহে ইহাঁর মুখখানি যেন নিমগ্ন। ইনি সমুদিত নবযৌবনশ্রীতে সমুজ্জ্বল—হাতে মোহনবাঁশী, সে বাঁশরীর স্বরালাপ প্রকৃতই অমৃত মধুর। গোপীগণ পীনস্তন-কুট্মলে ইহাঁর পূজা করেন।"

ইহাতে মনে হয়—প্রথমতঃ শ্রীমতীর ও গোপীদের নিভৃত লীলা-উৎকণ্ঠা-বর্ণনার জন্যই যেন লীলাশুকের স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি বাহ্যদশা হারাইলেন—অন্তর্দ্দশায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মনে হইল তিনি যেন তাঁহার স-প্রাণা সখীদের সঙ্গে বিরাজমানা। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-লাবণ্য ও তাঁহার ভূষণাদি সম্বন্ধেও তাঁহার স্ফূর্ত্তি হইল—গোপী লাবণ্য ভূষাদিতে ভূষিত সেই নির্ব্বিশেষ জ্যোতির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ যেন উছলিয়া উঠিল, তাই তিনি সমপ্রাণা সখীদিগের নিকট লালসা সহকারে বলিতেছেন—

"জ্যোতিশ্চেতসি ন শ্চকাস্তু—"সখীগণ এই জ্যোতি আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হউন। এই জ্যোতি মনোনেত্রের রসায়ন—অতি অদ্ভুদ—আমরি মরি—কি সুন্দর জ্যোতি—কেমন মধুরোজ্জ্বল"—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আরও একটুকু বিশেষ স্ফুর্ত্তি প্রকাশ পাইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন্ :—

"মাধুর্য্যমগ্নাননম্"—"শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল মাধুর্য্য-মগ্ন—কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ডে এবং স্মিত-সুধা-বিরাজিত অধরে যেন মাধুর্য্যের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই পূর্ণ স্ফূর্ত্তির উদয় হইল ; তখন তিনি আরও দেখিতে পাইলেন :—

"প্রোন্মীলন্নবযৌবনম্"—"এই জ্যোতিঃ-পুঞ্জ যেন নবযৌবনের লাবণ্যরাশিতে পরিপূর্ণ।" এই অবস্থায় তিনি আরও দেখিতে পাইলেন :—

"বর্হোত্তংস-বিলাস-কুন্তল-ভরম্"—ময়ূরের পুচ্ছ-শোভিত মোহন চূড়া—সেই চূড়া,—চাঁচর চিকণ-কুন্তল রাশিতে আবদ্ধ। নৃত্য-বিনিন্দি শ্রীকৃষ্ণের গমন ভঙ্গীতে সেই কুন্তল দাম যেন মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া আন্দোলিত হইতেছে। তখন তিনি আরও দেখিলেন :—

"প্রবিলসদ্‌বেণু-প্রণাদামৃতম্"—শ্রীকৃষ্ণ বাঁশরী বাজাইতেছেন। বাঁশরীর স্বরালাপ-বিলাস এক মহাবৈভব। বংশীনাদের আর এক বৈভব,—মহামাধুর্য্য। এই মাধুর্য্য প্রকৃতই অমৃত,—যেন মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। বাঁশরীর রবে শুষ্ক স্থাবরাদি সজীব হইয়া উঠে, এইজন্য বংশীনিনাদ প্রকৃতই অমৃত। মাধুর্য্য-মগ্নানন, নবযৌবন-লাবণ্যভূষিত নবকিশোর জ্যোতির্ম্ময় সুধামধুর বংশীবদন শ্যামসুন্দরের লাবণ্যচ্ছটা উচ্ছলিত রূপ-মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে লীলাশুক আরও দেখিতে পাইলেন :—

"আপীনস্তন-কুট্মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতম্"—ব্রজবধূগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নবযৌবন

মাধুর্য্যে মধুর সেবা করিতেছেন। তিনি এই সময়ে আরও দেখিলেন :—

"জগতামেকাভিরামাদ্ভুতম্"—জগতে এমন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের চিত্র আর কোথাও নাই—এমন নয়নের অভিরাম—মনের অভিরাম বস্তু আর দ্বিতীয় নাই—এই নয়নানন্দ সুন্দর ছবির আর দ্বিতীয় নাই—তাই ইনি অদ্ভুত।"

রামানন্দ—দেখিলে তো কি সুন্দর প্রত্যক্ষ! মাধুর্য্যের কবি এই কবিতায় কেমন মাধুর্য্য-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবুক ভক্তদিগের ধ্যানের জন্য এই মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন"—বলিতে বলিতে মহাপ্রভু নীরব হইলেন—নয়ন মুদিয়া যেন এই মাধুর্য্য-সুধা পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কমল নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রামরায় নির্নিমেষ নয়নে মহাপ্রভুর সেইরূপ রাশিতে "মাধুর্য্য মগ্নাননের" পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইয়া স্বরূপকে বলিলেন—স্বরূপ ঠাকুর এই যে "মাধুর্য্য মগ্নাননের" ব্যাখ্যা শুনিলে, এইবার তাহা প্রত্যক্ষ কর। স্বরূপ, রামানন্দের কথায় কোনও উত্তর না দিয়া কোমল মৃদু কণ্ঠে গান ধরিলেন :—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চোঅত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥
কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
নীলাচলে মাধুরী উজোর ॥
রক্তিম চরণ কমল তলে সঞ্চরু
ভক্ত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশ রহত অগোর ॥

স্বরূপের গান শেষ হইতে না হইতেই রামানন্দ বলিলেন—তুমি চতুর-চূড়ামণি—এই সময়ে যত পার ;—উনি নয়ন মেলিলে আর মনের কথা মুখে আনিতে পারিবে না।

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন—বটেই তো—তবে তাড়াতাড়ি আর একটি গাইতেছি—

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র
বেঢ়ল ভকত নখতবৃন্দ
অখিল ভুবন উজোরকারী
কুন্দ-কনক কাঁতিয়া।

অগতি-পতিত-কুমুদ বন্ধু
হেরত উছল রসক-সিন্ধু
হৃদয়-কুহর-তিমির হারী
উদিত দিন হুঁ রাতিয়া ॥
সহজ সুন্দর মধুর দেহা
আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহা

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
নীলাচলে মাধুরী উজোর ॥
রক্তিম চরণ কমল তলে সঞ্চরু
ভক্ত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশ রহত অগোর ॥

স্বরূপের গান শেষ হইতে না হইতেই রামানন্দ বলিলেন—তুমি চতুর-চূড়ামণি—এই সময়ে যত পার ;—উনি নয়ন মেলিলে আর মনের কথা মুখে আনিতে পারিবে না।

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন—বটেই তো—তবে তাড়াতাড়ি আর একটি গাইতেছি—

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র
বেঢ়ল ভকত নখতবৃন্দ
অখিল ভুবন উজোরকারী
কুন্দ-কনক কাঁতিয়া।

অগতি-পতিত-কুমুদ বন্ধু
হেরত উছল রসক-সিন্ধু
হৃদয়-কুহর-তিমির হারী
উদিত দিন হুঁ রাতিয়া॥

সহজ সুন্দর মধুর দেহা
আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহা

ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত
মত্ত করিবর ভাঁতিয়া।
নটন-ঘটন-ভৈগেল ভোর
"মুকুন্দ, মাধব, গোবিন্দ, বোল"
বোলত হসত ধরণী খসত
শোহত পুলক পাঁতিয়া॥
অসীম মহিম কো কহুঁ ওর
নিজ পর ধরি করত কোর
প্রেম অমিয়া হরখে বরখি
তরখিত মহী মাতিয়া।
সো রসে উত্তম অধম ভাস
বঞ্চিত একল গোবিন্দ দাস
কো জানে কি খেণে কোন গরল
কাঠ কঠিন ছাতিয়া॥

রামরায় হাসিয়া বলিলেন—ঠাকুর তুমি এতও অঘটন ঘটাইতে পার,—ভবিষ্য কবিকে বর্ত্তমানে হাজির করিয়াছ!

স্বরূপ বলিলেন—বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ বুঝি না—লীলা নিত্য—লীলা-রচনার কবিও নিত্য। "মাধুর্য্য-মগ্নানন"—ঠিক দেখা হইল কি না, তাই বল।

মহাপ্রভু চকিত ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "রামরায়—তার পর। ভাল, যেন স্বরূপের মধুর কণ্ঠের মৃদু গানের কোমল ঝঙ্কার স্বপ্নের ন্যায় অস্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইয়াছিলাম। স্বরূপ, কি গান

করিতেছিল? স্বরূপের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"স্বরূপ, তুমি কি গান করিতেছিলে?"

স্বরূপ অকুণ্ঠ চিত্তে বলিলেন—"আজ্ঞে, 'সই "মাধুর্য্যমগ্নাননের গানটী।"

মহাপ্রভু—"তবে আবার গাও—শুনি।"

রামরায় বাধা দিয়া বলিলেন—"এক গান কত বার হইবে—সে গান থাকুক। তোমার প্রীতির জন্য উনি না-হয় আর একটি গান করুন।"

স্বরূপ বলিলেন—"তাই হোক্।" এই বলিয়া তিনি আর একটি গান আরম্ভ করিলেন:—

কিবা সে শ্যামের রূপ সুধাময় রস-কূপ
নয়ন জুড়ায় যাহা চেয়ে।
হেন মোর মনে হয় যদি লোক ভয় নয়
কোলে করি তারে যেয়ে ধেয়ে॥
জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু
উদইছে সুধু সুধাময়।
নয়ন-চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥

মহাপ্রভু বলিলেন—"এও উত্তম,—কিন্তু "মাধুর্য্যমগ্নানন" হইল কি?"

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন—"তার তুলনা তারই কাছে।" উহার

জুড়ি নাই। আমি গানে উহা ফুটাইতে পারিব না; কিন্তু তোমাকে উহা দেখাইতে পারি।

মহাপ্রভু। কিরূপে?

স্বরূপ তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানা দর্পণ আনিয়া মহাপ্রভুর হাতে দিয়া বলিলেন, "একবার চাহিয়া দেখ।"

মহাপ্রভু জিভ্ কাটিয়া দর্পণ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—তুমি পাগল। সন্ন্যাসীর হাতে দর্পণ দিতে আছে?

স্বরূপ অকুণ্ঠভাবে বলিলেন—আমি সন্ন্যাসীর হাতে দর্পণ দিই নাই। রায় মহাশয়,—বল দেখি—আমি কি সন্ন্যাসীর হাতে দর্পণ দিয়াছি?

রামরায়। আমি তো এখানে সন্ন্যাসী দেখিতে পাই না।

মহাপ্রভু। আমি কি সন্ন্যাসী নই?

রামরায়। নিশ্চয়ই নও।

মহাপ্রভু। তবে আমি কি?

রামরায় উচ্চ হাসিয়া বলিলেন—কত দিন—কত বার আর ছল করিবে, বল। চোরকে বমাল গ্রেপ্তার কর, তবু চোর বলিবে আমি চোর নই। আমাদের কাছে আর কত বার লুকোচুরি করিবে? তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের "মাধুর্য্যময়াননে"র ব্যাখ্যা করিতেছিলে আমরা তোমার মুখের দিকে চাহিয়া ঠিক্ দেখিয়াছিলাম—সেই "মাধুর্য্যময়ানন"।

মহাপ্রভু রামরায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"চুপ কর—ও কথা মুখে আনিতে নাই—ওরূপ করিলে আমি আর এখানে

থাকিব না। আমি নিজের জ্বালায় অস্থির—তার উপরে তোমাদের এই সকল কথা শুনিলে আরও যাতনা হয়। তোমরা আমার পরম বন্ধু। তোমাদের নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া শান্তি পাই। রামরায়, কর্ণামৃতের পদ্যগুলি প্রকৃতই কর্ণের অমৃত—আমার প্রাণ যাহা চায়, কর্ণামৃতের পদ্যে তাহাই দেখিতে পাই। আরও একটা পদ্য আমি বলিতেছি—

মধুরতর-স্মিতামৃত-বিমুগ্ধমুখাম্বুরুহম্
মদশিখি-পিঞ্ছ-লাঞ্ছিত-মনোজ্ঞকচ-প্রচয়ম্।
বিষয়-বিষামিষগ্রসন-গৃধ্নুনি চেতসি মে
বিপুলবিলোচনং কমপি ধাম চকাস্তু চিরম্॥

লীলাশুক শ্রীমতীর ভাবে বলিতেছেন—"সখিগণ, তোমরা হয় ত বলিতে পার, সন্তাপ দেওয়াই যে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া লাভ কি? এ কথা ঠিক, কিন্তু আমি কি করিব? আমার চিত্ত তো আমার বশীভূত নয়—আমার চিত্ত বিষয়-বিষরূপ আমিষ-গ্রাস করার জন্য অতি লোভী। আমি শ্রীকৃষ্ণকেই 'বিষয়' বলি। কেননা যিনি স্বমাধুর্য্যে মনোভৃঙ্গকে বন্ধন করেন তিনিই বিষয়*। জগতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এমন বিষয় আর কি আছে? আর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর বিষয়ই বা আর কি আছে? কিন্তু এই 'বিষয়ে' বিষ ও অমৃত একত্র মিলিত। কেন না—ইনি যেমন এক দিকে বিষের ন্যায় দাহক, তেমনি অপর দিকে

* বিশেষেণ সিনোতি—স্বমাধুর্য্য-মধুনি মনোভৃঙ্গং বধ্নাতীতি—বিষয়ম্'।

অমৃতের ন্যায় লোভনীয়।* এই বিষয়-বিষ-ধামের এমনই আকর্ষণ যে ইহার প্রতি চিত্ত একবারে আকৃষ্ট হইলে ইনি তৎক্ষণাৎ সেই চিত্তকে আত্মসাৎ করেন। কিন্তু হায়, আমার চিত্ত এতই অবশ যে, উহা এই শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-বিষয়-বিষামৃতে সততই আকৃষ্ট। পতঙ্গ অনল-শিখায় ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরে, কিন্তু তথাপি অনল-শিখার সৌন্দর্য্য-লোভত্যাগ করিতে পারে না। সখি, এই জ্যোতির্ম্ময়

---

* শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যে বিষামৃতের একত্র মিলন—বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের ১৮ শ্লোকেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—তদ্‌যথা :—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দ-নন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।

এই পদটী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদেও উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদ্যে শ্রীল কবিরাজগোস্বামী ইহার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন :—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষ-জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।

দেবতার মুখখানি সুমধুর হাসে সমুজ্জ্বল, চক্ষু দুইটী বিপুল, মদমত্ত-শিখিপুচ্ছ-নিবদ্ধ চূড়ায় ইহার কেশ-পাশ অতি মনোহর। সখি, আমি কৃষ্ণরূপ-অনল শিখায় ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিব—তাহাতে আমার দুঃখ নাই তথাপি শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্ট চিত্তে সর্ব্বদাই যেন সেই শ্যামল সুন্দর জ্যোতিঃ বিরাজমান থাকে।"

"আমার মনের সাধ চিরদিনই যেন সেই চির সুন্দর আমার হৃদয়-পটে বিহার করেন—তাঁহার রূপের কথা বলিতে বলিতে আমার ভাষা নীরব হইয়া পড়ে, তথাপি কিছুই বলিতে পারি না"—

মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং বিভো
মুরলী-নিনাদ-মকরন্দ নির্ভরম্।
মুকুরায়মানমৃদুগণ্ডমণ্ডলম্
মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাম্।

"সখি, সেই বিভুর মুখ-পদ্মখানি সততই যেন আমার হৃদয়-সরসীতে শোভা পায়। "বিভু"—বলিতেছি কেন? কেনইবা বলিব না?—তিনি যে মাধুর্য্য-চাতুর্য্যাদি সর্ব্ব সম্পৎপূর্ণ। তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলখানি আমার নিকট পদ্মের ন্যায় মনে হয়। তুমি হয়ত বলিবে—এ পদ্মের মকরন্দ কোথায়? ইহাতে মকরন্দ নাই কি?—সুমধুর বংশী-নিনাদই এই পদ্মের মকরন্দ। প্রাণ-বল্লভের গণ্ড দুইখানি যেন দর্পণস্বরূপ ঝলমল করিতেছে—যেন ইন্দ্রনীলমণি। নয়ন-কমল ভাবোদ্গারে ও স্মর-মদে ঈষৎ বিকশিত—যেন মুকুলিত। সখি, শ্যামচাঁদের মুখ-কমল সততই

যেন আমার হৃৎসরোবরে বিরাজ করে। মনোমোহনের শ্রীমুখ-কমল দেখিয়া আমার এক একবার মনে হয়, তাঁহার প্রফুল্ল মুখ-কমলের উপরে যেন দরবিকশিত—মুকুলিত নয়ন-কমল প্রকাশ পাইতেছে—একটি ফুল্ল-কমলের উপরে যেন ঈষৎ বিকশিত দুইটি কমল-কলি। আহা, কি অদ্ভুত দৃশ্য। আমার আরও মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে বুঝি বহু বহু মুকুলিত নয়নপদ্ম বিরাজিত। তাঁহার শ্রীগণ্ডদর্পণে ব্রজবধূদিগের ভাবোদ্গারপূর্ণ মুকুলায়মান নয়ন-পদ্মসমূহের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে—বোধ হইতেছে ইহারা যেন সখ্য করার জন্যই মুখ-কমলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আবার আরও মনে হয়—কোনও গোপীর নয়ন-যুগল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডমুকুরে প্রতিফলিত হইয়া শ্রীমুখপদ্মে যেন খঞ্জনের ন্যায় শোভা পাইতেছে।”

“লীলাশুক দিব্যনয়নে শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীর এই ব্রজলীলা-বিলাসময়ী শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন—এই সকল পদ্যে তাহারই কিছু কিছু চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। রামরায়—ইহার প্রতি অক্ষরেই যেন শ্রীভগবানের অনন্তমাধুর্য্য বিজড়িত ও বিরাজিত।”

রামরায় ও স্বরূপ বিস্মিতভাবে প্রভুর মুখকমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা-সুধা পান করিতেছিলেন, আর দেখিতে-ছিলেন—“প্রভুর মুখকমলে যেন শত শত মকরন্দ ফোয়ারা আনন্দ-ধারায় বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।”

বলিতে বলিতে মহাপ্রভু ভাবাবেশে নীরব হইলেন। তখন

স্বরূপ মহাপ্রভুর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই যেন ভাব বুঝিয়া গান ধরিলেন :—

কি রূপ হেরিনু মধুর মুরতি
পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক আর॥
বর বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন-চাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবন মোহন ফাঁদ॥
নব জলধর রসে ঢর ঢর
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন
মণিমুকুতার মালা॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কেবা কৈল নিরমাণ।
তরুণ নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম-বাণ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজ ভীম কহে সেরূপ-নাগর
দেখিলে পরাণ রয়॥

বসন্তের কোকিল-কাকলির ন্যায় স্বরূপ, মধুর কণ্ঠে মৃদুমধুর তানে গান শেষ করিলেন—গায়ক নীরব,—শ্রোতৃবর্গ নীরব—সকলের হৃদয় হইতেই রসের উৎস অশ্রুধারায় উৎসারিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বরাগ।

বৈশাখের শেষ ভাগে সন্ধ্যা প্রায় লাগে-লাগে তখনও সূর্য্য অস্ত হয় নাই—সাগরের নীল জলে রবির কিরণ চিক্ চিক্ করিতেছে—তীরে নিবীড় পত্রময় উচ্চ তরুর পাতায় পাতায় সন্ধ্যার সোণালি রঙ্ ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্য সাগর-জলে ডুবিতেছেন—সাগরতটের বনভূমি, মধুরকণ্ঠ বিহগগণের বিবিধ মধুর তানে মুখরিত। মানুষের সমাগম ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এই সময়ে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতায় তাঁহার অতি প্রিয় অশ্বত্থতলে আসিয়া বিষণ্ণভাবে উপবেশন করিলেন।

নব নব কচি-কচি সরস সজীব ও সুন্দর পত্ররাজিতে অশ্বত্থ বৃক্ষটীতে প্রকৃতই যেন কৃষ্ণ-প্রেমের নবানুরাগ ফুটিয়া উঠিতেছে—উহার পশ্চাতে চিরশ্যামল নিবীড় বনভূমি—সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী স্থিরগম্ভীর নীল জলধি—আর উহারই মূলে—আমাদের কনককান্তি সজল-নয়ন,—প্রেমে ঢল-ঢল নবীন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া প্রভু অধোবদনে বসিয়া আছেন, আর নয়নযুগল হইতে অশ্রুমালা গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছে। সঙ্গে স্বরূপ ও রায় রামানন্দ—উভয়েই নীরব।

প্রভু এক একবার শ্যামল সাগরের দিকে আড় নয়নে চাহিতে-ছেন—তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা যেন আরও বাড়িয়া উঠিতেছে—নয়নে ও বদনে স্পষ্টতঃই সে চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া হৃদয়ের আবেগে চাপ দিয়া প্রভু বলিলেন,—"রামানন্দ—প্রাণের সখা—আমি কোথা হইতে কোথায় আসি-লাম—সন্ন্যাস লইলাম—মনে করিলাম—নিশ্চিন্ত হইয়া মনের সুখে কৃষ্ণ-নাম করিব। নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাক্—আমি যে কি চিন্তায় দিন যামিনী দগ্ধ হইতেছি—তা তোমরা ছাড়া বুঝিবার আর কেহ নাই—তোমরাও সকল সময়ে সকল ব্যথা বুঝিবে না। কৃষ্ণ আমার এ কি করিলেন? আমি মনের জ্বালায় শান্তি-লাভের জন্য ঘরের বাহির হইলাম—সে জ্বালার শান্তি হইল না—উহা আরও বাড়িয়া উঠিল।

কোথায় গেলে—কি করিলে সেই নয়ন-রঞ্জন—হৃদয়-রঞ্জন যমুনাবিহারী শ্রীহরির দেখা পাইব? আর কতকাল দিবানিশি এমনি করিয়া এ জ্বালা ভোগ করিব? তোমার মুখে যতক্ষণ কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাই—ততক্ষণ কোনরূপে সময় কাটিয়া যায়। স্বরূপ কৃষ্ণ-লীলা গান করেন—তাপিত প্রাণ অনেকক্ষণ তাহাতে ডুবিয়া থাকে—গান শেষ হয়—স্বরূপের কণ্ঠ নীরব হয়—কিন্তু তাহার ঝঙ্কার অনেকক্ষণ আমার কাণে লাগিয়া থাকে। গানের ঝঙ্কার প্রাণের পরতে পরতে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে কি আমার জাগ্রত অবস্থা, না স্বপ্নের অবস্থা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমি আরও বুঝিতে পারি না—স্বরূপের গান অমৃত কি বিষ—

সুখকর কিংবা ভয়ঙ্কর। সে গানের ঝঙ্কার যেমনই থামিয়া যায়—আবার শত বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় হৃদয়ের যাতনা বাড়িয়া উঠে। আবার তখনই ঘোরতর বিষম হাহাকার। এমন করিয়া আর আমায় কত দিন বাঁচাইবে বল ?

ব্রজ-রসের সুখের স্বপন—কি সুন্দর—কি মধুর—কিন্তু হায় জাগরণে কি যাতনা। মনে হয় সারা জীবন ঐ রসে ডুবিয়া থাকি—ঐ স্বপনে মাতিয়া থাকি—কিন্তু তাহা তো ঘটে না—আবার জাগিয়া উঠি—সব শূন্য-শূন্য—যেন অজানা-অচেনা অবাঞ্ছিত জগতে আসিয়া ছট্ ফট করি। তখন তোমরাই আমার শরণ—তোমাদের কৃষ্ণ-কথায় সেই সুখের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। সে স্মৃতি তখন অনুভবের ন্যায় গাঢ় হয়—তখন অনুভবও যেন সাক্ষাৎ দর্শনসুখে পৌঁছাইয়া দেয়। এই ত আমার অবস্থা। রামরায় ব্রজবালাদের পূর্ব্বরাগের কথা এখন আমায় দয়া করিয়া শুনাইবে কি ?

রামরায় কাতরকণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—"দয়াময়, আমি অধম—আপনার লীলা কি বুঝিব? আপনি কাঠের পুতুলীকে দাঁড় করিয়া তাহার মুখে ব্রজ-রস-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারেন—আপনার অসাধ্য কি? আপনার আদেশ ও শক্তি-সঞ্চার,—একই কথা। আমার মুখে কথা বাহির করিয়া আপনি শুনিবেন—ইহাই তো আপনার ইচ্ছা। তা ইচ্ছাময়—আপনার ইচ্ছা আপনি সফল করুন।"

এই বলিয়া রামরায় প্রভুর চরণের দিকে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি

রাখিয়া নয়ন নিমীলন করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুমালা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। স্বরূপ ও মহাপ্রভু, ভাবাবিষ্ট রামরায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—রামরায় মৃদুলমধুর কণ্ঠে ভাবাবিষ্ট চিত্তে নয়ন মুদিয়া বলিতে লাগিলেন :—

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিতপল্লব-
বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণিতল-
বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্॥
যুবতী-মনোহর-বেশম্।
কলয় কলানিধিমিব ধরণী মনু-
পরিণত রূপ-বিশেষম্॥
খেলা-দোলায়িত-মণিকুণ্ডল-
রুচি-রুচিরানন-শোভম্।
হেলা-তরলিত-মধুর-বিলোচন-
জনিত-বধূজন-শোভম্॥

রায় রামানন্দ এই গীতটী গানের সুরে আবৃত্তি করিয়া নীরব হইলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। রূপ হইতেই পূর্ব্বরাগের উৎপত্তি। ব্রজ-বিহারী, শ্রীবৃন্দাবনে যে রূপ প্রকটন করেন, সে রূপের আকর্ষণে স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই তাঁহার অভিমুখে আকৃষ্ট হয়—সেই রূপের টানে কেহই তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না—তাঁহার হ্লাদিনীস্বরূপা ব্রজবালাগণের প্রেমময় চিত্ত তো স্বভাবতঃই তাঁহার অভিমুখে আকৃষ্ট—তাঁহাদের সম্বন্ধে

আর কথা কি? এই রূপের আকর্ষণ হইতেই পূর্ব্বরাগের উৎপত্তি। তাই রায় মহাশয় পূর্ব্বরাগ-বর্ণনের পূর্ব্বে শ্যামসুন্দরের ভুবন-মোহন রূপ-বর্ণন করিলেন। রামানন্দের এই গীতিটী অবলম্বনে যে পদ বিরচিত হইয়াছে তাহা এই :—

যুবতী-মনোহর ওনা বেশ গো।
অবনী মণ্ডলে সখি চাঁদের উদয় যেন
সুধাময় রূপের বিশেষ গো॥
চূড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গো
তাহে উড়ে ময়ুরের পাখা।
যেন চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো
ললাটে চন্দন-বিন্দু-রেখা॥
সঘনে দোলায় কানে মকর-কুণ্ডল গো
কুলবতী-কুল মজাইতে।
উহার নয়ন-কুসুম-শর মরমে পশিল গো
ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে॥
এমন সুন্দর রূপ কোথা হ'তে এলো গো
মন মোর ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই ও রূপ-সাগরে গো
কিবা সে নাগর বিনোদিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণের ভুবনাকর্ষি রূপ বা রূপের কথা-শ্রবণে তাঁহাকে পাওয়ার জন্য চিত্তের যে বলবতী লালসা—তাহাই পূর্ব্বরাগ। রামানন্দ তাঁহার নিজকৃত গীতিটী ভাবাবেশে যখন উচ্চারণ

করিতেছিলেন, মহাপ্রভু তৃষিতের ন্যায় যেন তাঁহার বাক্য-সুধা পান করিতেছিলেন।

রামরায় কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া—আবার বলিতে লাগিলেন "পূর্ব্বরাগ—হৃদয়ের মধুরোজ্জ্বল স্ফূর্ত্তি—উহা চিত্ত-কাননে নব বসন্ত-প্রবাহ—প্রেমের প্রথম প্রস্ফুরণ। উহার প্রথম প্রবাহে দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি নবমাধুর্য্যে জাগিয়া উঠে। দ্বিতীয় প্রবাহে—প্রাণের প্রিয়তম দেবতার জন্য চিত্ত চঞ্চল ও অধীর হইয়া পড়ে। উহার তৃতীয় প্রবাহে প্রণয়ি-চিত্ত প্রেমের ধ্যানে বিভোর হয়।

শ্রীমতী রাধা, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই বলিলেন :—

কি রূপ হেরিনু মধুর মুরতি
পিরীতি-রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক যার॥

পূর্ব্বরাগের প্রথম অবস্থায় চিত্তবৃত্তিতে এইরূপ নববসন্তের মহামাধুর্য্যের উদয় হয়। কিন্তু এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত-চাঞ্চল্য। প্রিয়জনের যে প্রেমময় চিত্র হৃদয়-পটে অঙ্কিত হয়, তাঁহার সন্দর্শনের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে। বিশাখা, রাধিকার নবপ্রেমের পূর্ব্বরাগের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ললিতাকে বলেন, দেখ ললিতা, শ্রীমতীর অবস্থা দেখ—শ্যামসুন্দরের দর্শনের জন্য ইহার চিত্ত একবারে অধীর হইয়া উঠিতেছে। এক মুহূর্ত্তও ইনি ঘরে স্থির থাকিতে পারিতেছেন

না—একবার ঘরে যাইতেছেন—আবার ঘরের বাহির হইতেছেন। উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল-চিত্ত প্রাণবন্ধুকে দেখার জন্য সততই আকুল।

ইহার পরক্ষণেই—পূর্ব্বরাগে প্রেমের ধ্যান।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী-পারা ॥

ললিতা প্রণয়-কোপ প্রকাশ করিয়া বিশাখাকে বলিলেন—"প্রিয়সখি বিশাখিকে—তুই তো এ বিপদের গোড়া। তুই যদি শ্যামের নাম ও উহার রূপের কথা না বলিতিস্, তবে কি আমাদের সখী আজ এমন হতো? সুধু কি তাই—তুই চিত্রপট সেই চিত্ত চোরের কোমল-নীলচ্ছবি আঁকিয়া উহাকে কেনই বা দেখাইলি—দেখাইয়া পাগল করিলি। পূর্ব্বে তো আর কখনও প্রিয় সখীর এ ভাব দেখি নাই।"

এই বলিয়া ললিতা শ্রীমতীর নিকটে বসিয়া বিষণ্ণভাবে অতি মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"সুবদনি চন্দ্রাননি, রাধে, সখি, তোমার একি ব্যাধি হলো? তোমার মন সততই উচাটন—দৃষ্টি শূন্য-শূন্য—কথার উত্তর না দিলে নয় বলিয়াই যেন আমাদের সহিত কথা বল—এত আনমনা কেন? তোমার হেমকান্তি

ঝামর হইয়া গিয়াছে—নয়নযুগল অরুণিত ও সজল। শিশিরসিক্ত বিমলিন পদ্মের ন্যায় মুখকান্তি শুষ্ক—তোমার ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা তোমার আপন জন—চির-সহচরি—আমাদের কাছে গোপন কি? সখি, তোমার যাতনায় আমরা মরমে মরিয়া রহিয়াছি। মন খুলিয়া বল—তোমার এ দশা হইল কেন?"

ললিতার মর্ম্মবাক্যে শ্রীরাধার হৃদয় উছলিয়া উঠিল—ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—সরম দূরে রাখিয়া মরমের কথা উঘাড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখি, আমার কথা আর কেন সুধাও। মনে করিয়াছিলাম—মনের ভাব মনে চাপা দিয়া রাখিব—নিজের মনের আগুনে নিজে গুমরিয়া গুমরিয়া পুড়িয়া মরিব—তোমাদিগকে জানাইব না—জানাইয়া আমার দুঃখে তোমাদিগকে দুঃখ দিব না। কিন্তু হৃদয়ের বেগ চাপা দিয়া রাখিতে পারিলাম না: তোমাদের কাছে গোপন করার কি আছে? আর সে চেষ্টা করিয়াই বা ফল কি? আর কতক্ষণই বা গোপন রাখিতে পারিব? আমার ব্যাধির কথা জানিতে চাও—এ কি ব্যাধি, তাহা বলিতে পারি না। ঘরে বাহিরে কোথাও আমার শান্তি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, চিত্ত অধীর—আমার চিত্ত আমাতে নাই—ঠিক্ কথাই তোমায় বলিতেছি, এখন আমার মরণই ভাল:—

সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥

পহিলে শুনিলুঁ যব শ্যাম দুই আখর
তৈখন মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কো অছু পটে দরশায়নু
নবজলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইয়ে
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি॥

বলিতে বলিতে শ্রীমতীর বাক্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে আরও কি-যেন-কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—বলিতে পারিলেন না—ললিতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। ললিতা উৎকণ্ঠার সহিত বিশাখাকে বলিলেন—"দেখলি তো বিশাখা—তোর কাজের পরিণাম এখন দেখ্‌লি তো? এমনও কি করিতে হয়? এখন কি উপায় কর্‌বি কি কর্‌।"

বিশাখা তাড়াতাড়ি বীজন আনিয়া শ্রীমতীর মাথায় ব্যজন করিতে লাগিলেন, ললিতা সুস্নিগ্ধ শীতল জলে মুখমণ্ডলে সেচন করিয়া শ্রীমতীর কর্ণে শ্যাম-নাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমতী অর্দ্ধ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাষায় বলিতে লাগিলেন—শ্যাম—শ্যাম—শ্যাম—কি মধুর—কি সুন্দর—কি মনোহর! ফিরে চাও;—না—না,—নাম—নাম! নামমাত্র তবে কি সুধুই নাম? নামই কি শ্যাম? কই—কিছুই তো বুঝিতে পারি না! না না—নাম হইবে কেন?—শ্যাম—শ্যামই বটে। ফিরে

দাঁড়াও বঁধু—একবার দেখি—বন্ধু, ফিরে দাঁড়াও। না—নাম—সুধুই নাম—তবে কি নামেরই এত প্রতাপ! ললিতে—ললিতে—এ তো শ্যাম নয়—এ যে নাম। বল—নামই বল, নামই আমার শ্যাম! কি সুন্দর, কি মধুর ঐরূপ,—

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন চরণকী সাজ।
অরুণ নয়ান গতি বিজুড়ি চমক জিতি
দগধল কুলবতী লাজ॥
সজ ন, যাইতে পেখনু কান।
তব ধরি জগভরি ভরল কুসুম-শর
নয়ানে না হেরিয়ে আন।

ললিতে—তবে বল এখন কি করি? তার নাম—শ্যাম—নামই শ্যাম। ঐ নামই আমার সম্বল—তবে এখন

শ্যাম শ্যাম বলি শ্যাম নাম জপই
ছার তনু করব বিনাশ।"

মহাপ্রভু। চমৎকার—অতি চমৎকার! রামরায় পূর্ব্বরাগে, তবে বুঝি শ্রীরাধিকা শ্যামকে নাম-রূপেই বুঝিয়া লইলেন?

রামরায়। হাঁ, প্রভু।

মহাপ্রভু। নাম ও নামী যে অভিন্ন—এ কথা, তা হলে, ভালই বুঝা গেল। কি বল, রামরায়?

রামরায়। হাঁ প্রভু। ইহা ত ঐ শ্রীমুখে অনেকবার শুনিয়াছি।

মহাপ্রভু। বলেছি বটে। কিন্তু বলা যত সহজ, অনুভব করা তত সহজ নহে। শ্রীরাধার ভাবের আভাস না পাইলে এই তত্ত্বে প্রবেশের অধিকার হয় না। তবে তোমরা শ্রীমতীর গণ; তোমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

রামরায়। (ঈষৎ হাসিয়া) রসময়, শ্রীমুখে যাহা বলেন, সকলই শোভা পায়। শ্রীচরণতলে যে একটুকু স্থান পাইতেছি—ইহাই যথেষ্ট সৌভাগ্য।

মহাপ্রভু। যাক্ সে কথা। শ্রীমতী বলিলেন—শ্যামের নাম শুনিয়াই তাঁহার মন শ্যামের জন্য আকুল হইল। রামরায়—নামের এমনই শক্তি ?

রামানন্দ। হাঁ প্রভু। নামের শক্তির কথা তো আপনি বহুবার উপদেশ করিয়াছেন—কিন্তু পূর্ব্বরাগময়ী শ্রীমতীর হৃদয়ে নামের যে প্রভাব প্রকাশ পায়, আমরা তাহা কোথায় পাইব ? নামের মহিমা পরম উজ্জ্বল—আবার শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগও পরম মধুর—এই পরম উজ্জ্বলে ও পরম মধুরের যে অদ্ভুত সম্মিলন তাহা বাস্তবিকই চমৎকার !

মহাপ্রভু। রামরায়—তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথা অতি মধুর। সাক্ষাৎ দর্শনের পরে পূর্ব্বরাগের কি অবস্থা হয়, তাহা শুনাইবে কি ?

রামরায়। প্রভো—পূর্ব্বরাগ,—শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লাভের সাধক। পূর্ব্বরাগে উৎকণ্ঠা বাড়ায়—অতি উৎকণ্ঠায় দর্শন-লাভ হয়। শ্রীমতী উন্মাদিনীর ন্যায় সকল ভুলিয়া কৃষ্ণনামে ও কৃষ্ণধ্যানে

নিরন্তর মগ্ন থাকেন। একদিন কালিন্দী-তটে কুসুমিত কুঞ্জবনে সহসা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন—সে মদনমোহন রূপ দেখিয়া পশু পাখী পর্য্যন্ত বিবশ হইয়া পড়ে। তিনি দেখিলেন—

মরকত মঞ্জু- মুকুর মুখ-মণ্ডল-
মুখরিত-মুরলী-সুতান।
শুনি পশু-পাখী শাখীকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
কামিনী মনহি মুরতিময় মনসিজ
জগজন-নয়ন-আনন্দ॥
তনু অনুলেপন ঘন-সার-চন্দন
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল-চুম্বিত অবনী বিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক॥
অতি সুকুমার চরণতল শীতল
জীতল শরদরবিন্দ॥

রামরায়ের এই পদ-আবৃত্তি শেষ হইতে-না-হইতেই স্বরূপ কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া কামোদ-রাগে গান ধরিলেন—

জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু
উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন-চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥

স্বরূপের গান শুনিয়া মহাপ্রভু চমৎকৃত হইয়া তাঁহার মুখপানে অনিমিক নয়নে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু স্বরূপ সহসা নীরব হইলেন। মহাপ্রভু উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন "তার পর, স্বরূপ,—তার পর?"

স্বরূপ আবার গান ধরিলেন :—

সই, দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে গোকুলনারী হইয়াছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলানি
শোভিত গলের মাল।
মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে
বেড়িয়া তঁহি রসাল॥
দুইটী লোচন মদনের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে
পরাণ সহিতে টানে॥
চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সেই যে ভুলিল
কি তার কুল-বিচার॥

স্বরূপের গান শেষ হইল—কিন্তু গানের ঝঙ্কার শেষ হইল না! তিন জনেই ভাবাবিষ্ট হইয়া মধুময়ী গীতির সুধারসে বিভল

হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন—"রাম-রায়,—কৃষ্ণদর্শনজনিত পূর্ব্বরাগের প্রতাপ দেখ—

"জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয়িছে সুধু সুধাময়।
মন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥"

নবপ্রেমের ব্যাকুলতা ও উন্মত্ততা কি চমৎকার, নিমেষের বিলম্বও অসহ্য। শ্রীরাধিকা দেখিলেন—এত রূপ নয়—যেন সুধা-সিন্ধু; শ্রীমতী, নয়ন-সম্মুখে এই সুধাসিন্ধু দেখিয়া আকুল হইলেন—উহা পান করিবার জন্য সতৃষ্ণ হইলেন—এমনই তৃষিত—যে নিমেষের বিলম্বও সহ্য হয় না। স্বরূপ—এ পদও কাব্য-কল্পনার ভাষা নয়—অস্পষ্ট অনুভবও নয়—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ! ইহার তুলনা নাই। কি বল, রামরায়?

রামানন্দ। হাঁ প্রভু। তথাপি শ্রীমতী তখনও ভরপূর নয়নে শ্যামরূপ নিরখিতে পারেন নাই।

শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি—

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর-জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি, বিধি মোরে জানলুঁ বাম।

হুহু লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥
সু-নয়নী কহত— "কানু ঘন শ্যামর"
—মোহে বিজুরি সম লাগি !
রসবতী তাক পরশ-সুখে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জনু আগি ॥
প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজব
চপল জীবন মঝু সাধ।
গোবিন্দ দাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী রস-মরিযাদ ॥

শ্রীমতী বলিতেছেন—"সখি—আমি তো পূরা নয়নে শ্যামসুন্দরকে দেখি নাই, আধের আধ—আবার তার আধে, যখন সেরূপ দেখিলাম, তখন আমার মনে হইল,—কত শতকোটি কুসুম-শরে আমার হৃদয় জর-জর হইয়া গেল—প্রাণ যেন যায়-যায় হইয়া পড়িল। সজনি, আর আমার বুঝিতে বাকী নাই—বিধাতা আমার প্রতি নিশ্চয়ই বাম। নয়নের আট ভাগের এক ভাগে দেখিয়াই আমার এই দশা হইল, যে রমণী উভয় লোচন ভরিয়া শ্যামরূপ দেখিতে সাহস করে, তার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম"।

"সখি, লোকে কানুকে ঘনশ্যাম বলে ; যে বলে সে বলুক—কিন্তু আমার মনে হয় শ্যাম ঘনশ্যাম নয়—যেন সাক্ষাৎ বিজুরি। রসবতীরা তাহার পরশ-রস চায়, কিন্তু আমার মনে হয় শ্যামের

পরশ—রস নহে, উহা সাক্ষাৎ অনল। আমার আরও দুর্ভাগ্য দেখ,—প্রেমবতীরা প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করে—আর এই চঞ্চল জীবনের জন্য এখনও আমার সাধ ফুরায় না!"

রামানন্দের বাক্য শেষ হইতে না হইতে মহাপ্রভু উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন—"রামরায়—শ্রীমতী, যে শ্যামসুন্দর-সন্দর্শনের জন্য এমন উৎকণ্ঠিত, তিনি পূর্ণ নয়নে, সে শ্যামরূপ নিরীক্ষণ না করিলেন কেন?

রামরায়। প্রভো—শ্রীপাদ বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদে শ্রীমতী নিজেই ইহার কারণ প্রকাশ করিয়াছেন, উহা এই :—

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধ পরাণ-পয় পীড়সি
ই তুয় কোন বিবেক॥
দাহিন নয়ন পিশুন-গণ-বারণ
পরিজন বাম হি আধ।
আধ নয়ন-কোণে যব হরি পেখল
তাহি ভেল এত পরমাদ॥
পুর বাহির পথ করত গতাগত
কে নহি হেরত কান।
তোঁহর কুসুম-শর কতহুঁ না সঞ্চর
হামার হৃদয় পাঁচ বাণ॥

শ্রীমতী অতি যাতনাতেই বলিতেছেন—"মন্মথ, তোমাকে আর অধিক কি বলিব? আমি মাধবকে কোন প্রকারে একটুকু

দেখিয়াছি—আর সেই দৃষ্টি-অপরাধে তুমি আমার প্রাণ-পীড়া দিতেছ। বল দেখি, এ তোমার কেমন বিবেচনা?

আমি দুষ্টলোকের ভয়ে দক্ষিণ নয়নে শ্যামরূপ দেখিতে সাহস করি না। পরিজনগণের ভয়ে বাম নয়নের অর্দ্ধভাগও শ্যামদর্শনে নিবারিত। অর্দ্ধেক নয়নেও আমি তাঁহার রূপ দেখিতে পাই নাই—নয়ন-কোণে কিঞ্চিৎমাত্র দেখিয়াছি—তাহাতেই এত বিপদ!

গৃহের বাহিরে যাতায়াত করিতে কানাইকে কে না দেখে? কই, তোমার কুসুম-শর তো আর কোথাও সঞ্চরণ করে না! কেবল আমার হৃদয়েই তুমি পাঁচবাণ বিদ্ধ করিলে!"

মহাপ্রভু। এ অতি অদ্ভুত। কি বল, স্বরূপ?

স্বরূপ। অদ্ভুত ব'লে অদ্ভুত! ইহার যোড়া দেখা যায় না। রায়মহাশয়, যখন পদটী বলিতেছিলেন—তখন মনে হলো যেন স্বয়ং শ্রীমতী রায় মহাশয়ের মুখে আপন বেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

রামানন্দ। তবে শ্রীপাদ বিদ্যাপতির আরও একটি পদ বলিতেছি :—

আধ নয়ন কএ তহু কর আধ।
কতবা সহব মনসিজ অপরাধ॥
কা লাগি সুন্দরি দরশন ভেল।
যেও ছিল জীবন সেও দুরে গেল॥
হরি হরি কএোন কয়ল হাম পাপ।
যে সবে সুখদ তাহি তহ তাপ॥

সব দিশ কামিনী দরশন যায়ে।
তই অও বেয়াধি বিরহ অধিকায়ে॥
কঞোনক কহব মেদিনী সে থোল।
শিব শিব এহি জনম ভেল ওল॥

শ্রীমতী বলিতেছেন,—“আধ নয়নের আধভাগে—ঈষৎ কটাক্ষে শ্যামরূপ দেখিয়াছিলাম। তাতেই এত জ্বালা! বল দেখি মনসিজের একি অন্যায়—আমি এ অন্যায় আর কত সহ্য করিব? সজনি, কেনইবা শ্যামরূপ দেখিলাম, না দেখিয়া ছিলাম ভাল—দেখায় এই হইল—যে টুকু জীবন ছিল,—এখন তাহাও দূর হইল। হরি হরি, আমি কি পাপ করিয়াছিলাম যে সুখকর সামগ্রীও আমার পক্ষে এমন দুঃখজনক হইল। হরি হরি, এ দুঃখের কথা আর এ জগতে কাহাকে বলিব—সেরূপ স্থল বড় অল্প। এবার বুঝি জীবন শেষ হইল।”

মহাপ্রভু ব্যাগ্রভাবে বলিলেন—“তার পর, রামরায়,—তার পর!

রামানন্দ। ইহার পরের কথা—স্বরূপ ঠাকুরের মুখে শুনুন। সে দিন সন্ধ্যায় আমি আর উনি সাগরতটে গিয়া ছিলাম। উহার মুখে একটী গান তখনও লাগিয়াই ছিল। আমি বলিলাম, ঠাকুর আপন মনে কি গাহিতেছ—ওরসের একটু ভাগ আমায় দিলে কি কমিয়া যাইবে? তখন উনি গাইতে লাগিলেন—“কানু হেরিব ছিল মনে বড় সাধ।”

মহাপ্রভু। এটীও তো শ্রীপাদ বিদ্যাপতিরই পদ?

রামানন্দ। হাঁ—প্রভু।

মহাপ্রভু। স্বরূপ, তোমরা সে দিন সন্ধ্যায় সাগর-তটে গেলে—আমাকে ডাকিয়া নিলে না কেন? আমার প্রতি এত নিদয়! তা যাক্। "কানু হেরিব ছিল মনে বড় সাধ" গানটী শুনিতে আমারও কিন্তু বড় সাধ! একবার গাও তো, শুনি।

স্বরূপ আর অন্য কথার অপেক্ষা না করিয়া অমনি গান ধরিলেন।

কানু হেরিব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে ভেল এত পরমাদ॥
তব ধরি অবোধি মুগধি হাম নারি।
কি কহি কি শুনি কিছু বুঝই না পারি॥
শাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধস্ ধস্ করয়ে পরাণ॥
কা লাগি সজনি দরশন ভেল।
রভসে আপন জীউ পর হাথে দেল॥
না জানিয় কিয় করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেল মোর॥
এত সব আদর গেল দরশাই।
যত বিসরিয়ে তত বিসর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ধৈরয ধর চিতে মিলিবে মুরারি॥

স্বরূপ গানের তানে প্রাণ মিশাইয়া ব্রজ-বিরহিনীর আর্ত্তিতে

প্রাণ মিলাইয়া মিলাইয়া মৃদুমধুরকণ্ঠে এমনভাবে গান করিতে-ছিলেন—যে তাহার গানের সময়ে কেহই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি-লেন না। মহাপ্রভু একবারেই অধীর হইয়া পড়িলেন। রামানন্দ অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। স্বরূপের কণ্ঠ প্রথমতঃ গদ্‌গদ হইয়া পরে একবারে একবারেই নীরব হইয়া পড়িল। কৃষ্ণকথা-মুখরিত গম্ভীরা-মন্দির সহসা একবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। চিত্রপটের ন্যায় তিনখানি শ্রীমূর্ত্তিরই নয়ন হইতে নীরবে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"রামরায়, শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ—প্রেম-রস-সিন্ধুর এক মহাতরঙ্গ। প্রেমে, বিরহ—এক মহাশক্তি। ইহা শুনিলেও ভক্ত-চিত্ত শ্রীভগ-বানের জন্য আকুল হয়,—নিরন্তর তাঁহার অনুসন্ধান করে—অবশেষে একবারেই তন্ময় হইয়া উঠে। ব্রজরসে প্রবাস, মান ও মাথুরের ন্যায় পূর্ব্বরাগও বিরহ-ভাবের তরঙ্গে অধীর করিয়া তোলে। রামরায়, বিরহে বিরহে শ্রীরাধার কি যাতনাময় দশাই বিঘটিত হয়!

রামরায়। দয়াময়, তা'ত আপনাতেই দেখিতে পাইতেছি। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধি র সকল ভাবই তো প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

মহাপ্রভু। ওকথা ড়িয়া দাও। জান তো—আমি এক বাতুল। কি করিতে f করি, কি বলিতে কি বলি—তাহার কিছুই ঠিক নাই। ভ। ব্রজ-রসের কি জানি? তোমাদের

নিকট যাহা শুনি তাহারই কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিতে চাই—এইমাত্র। তোমরা না দিলে আমি কোথায় পাইব?

রামরায়। তা বেশ। যা বলিয়া খুসী হউন, তাই বলুন। এ রসনায় শক্তিসঞ্চার করিয়া আপনি যে ব্রজ-রস আস্বাদন করিতেছেন—ইহা কে না জানে? আপনি যন্ত্রী, এ দাসকে যে নিকটে বসিবার অধিকার দিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট।

মহাপ্রভু। আচ্ছা, রামরায়,—ব্রজবিরহিণী শ্রীরাধার মাথুর-বিরহে তো দশটা ভীষণ দশার কথা শুনা যায়—পূর্ব্বরাগেও তো সেই সকল দশার ভাব বুঝা গেল।

রামরায়। হাঁ প্রভু। পূর্ব্বরাগেও লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা।

মহাপ্রভু। স্বরূপ, জাগর্য্যা দশার একটী পদ তোমার মনে পড়ে কি?

স্বরূপ। কোন্ পদটী, প্রভু।

মহাপ্রভু। অই যে সে দিন রাত্রে এখানে গাইয়াছিলেন—"তুহুঁ মনোমোহন।"

স্বরূপ। "হাঁ, প্রভু। ঠিক মনে পড়েছে।"

এই বলিয়া স্বরূপ তিরোতা রাগিণীতে গাইতে লাগিলেন :—

তুঁহু মনোমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোঁহারি লাগি রোয়॥
নিশি দিশি জাগিয়া জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপিয়া পড়য়ে সোই ঠাম॥

যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয়ে তব রোয়॥
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাতে ততহি নাহি ভায়॥

স্বরূপ নয়ন জলে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গান শেষ করিলেন। মহাপ্রভু কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বুঝলে ত রামরায়?

রামানন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"বুঝেছি প্রভু—বুঝ্‌ব বই আর কি? প্রতি রোজই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি—যামিনী জাগিয়া নাম জপ,—ব্যাকুল রোদন,—থরহরি কম্পন, আর বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির হওয়ার চেষ্টা! মহাভাব-স্বরূপিণীর ভাবকান্তি লইয়াই তো এই রসরাজ-মহাভাব-মূর্ত্তির প্রকটন—দয়া করিয়া যাহা বুঝাইতেছ, তাহা বুঝিতেছি—যাহা শুনাইতেছ—শুনিতেছি, যাহা দেখাইতেছ তাহা দেখিতেছি—আবার যাহা বলাইতেছ—তাহাই বলিতেছি। কাজেই সকলি ঠিক বুঝিতেছি।

স্বরূপ মহাপ্রভুর দিকে হাসিয়া বলিলেন—"কেমন হয়েছে তো? রামরায়ের কাছে লুকোচুরি ভারি-ভুরি খাটিবে না। উহার কাছে, দয়াময়, তুমি নিজের রূপ গোপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলে—তাহা সফল হইয়াছিল কি? বলি, রসময়,—

করি বাঁধে যারা মাকসার জালে।
তারা কি কখনে ভোলে ইন্দ্রজালে॥

তুমি মূর্ত্তিমান পূর্ব্বরাগ—তুমিই মূর্ত্তিমান মাথুর। আমাদের কাছে আর এত লুকোচুরি কেন?" এই বলিয়া স্বরূপ হাসিতে

লাগিলেন—রামরায় অতি উৎসাহের সহিত যোগ দিলেন। গম্ভীরা-মন্দিরে হাসির তরঙ্গ উঠিল। গোবিন্দদাস নিরানন্দ ভালবাসিতেন না, নয়ন-জলে নয়ন-জলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া পড়িত। এই সময়ে সহসা হাসির তরঙ্গ-লহরী দেখিয়া গোবিন্দ ও শঙ্কর সে হাসিতে যোগ দিলেন।

মহাপ্রভু হর্ষপ্রফুল্লমুখে কল্পিত ক্রোধভাব দেখাইয়া বলিলেন—"এ বড় মন্দ নয়। আমায় এমনি ভাবে জব্দ করিবার জন্যই তোমরা বুঝি হাসির লহর তুলিয়াছ? আমার অপরাধ এই যে আপন মনের জ্বালায় রাত্রিতে ঘুমাইতে পারি না। তাহার সহিত ব্রজ-রসের পূর্ব্বরাগের সম্বন্ধ কি? আর আমি দীনহীন কাঙ্গাল সন্ন্যাসী—আপনার দুঃখে আপনি কাঁদি, তাহা লইয়া তোমাদের এ সকল কথা কেন?—এত হাসিই বা কেন?"

রামরায় সসম্ভ্রমে বলিলেন—"তুমি লীলাময়—স্ব-তন্ত্র। দীনহীন সন্ন্যাসীও তুমি—আবার ব্রজ-রসের রাস-বিহারীও তুমি। তোমার কথা বলিবার আমাদের শক্তিই বা কি—আর অধিকারই কি? আমাদের যে হাসি-কান্না—এ সকলি তোমারই লীলা। হাসাও তুমি—কাঁদাও তুমি। নিজেই পূর্ব্বরাগের অনন্তভাব প্রকটন করিয়া দেখাইতেছ—আবার আমাদের মুখে তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছ। ইহা কি হাস্যের বিষয় নয়?

মহাপ্রভু নম্রভাবে বলিলেন—"বলিয়াছি তো—আমি যে ব্রজ-রসাস্বাদন করি—তাহা ধার করা—আমার নিজের তাহাতে কিছুই নাই।"

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন—"সে কথা কে অস্বীকার করে? তাকি আর আমরা জানি না—বা বুঝি না?

মহাপ্রভু। আমি এই রসাস্বাদনের জন্য তোমাদের নিকটেই ঋণী।

স্বরূপ। মিছে কথা! এ ঋণের যিনি মহাজন, তাঁহার কথা গোপন রাখিলেও গোপন থাকে কি? সে রস-মাধুর্য্য চাপা থাকিবার নয়।

মহাপ্রভু। আচ্ছা, সে সকল কথা এখন থাক্। রামানন্দের কৃষ্ণকথায় ও তোমার গানে আজ যে পূর্ব্বরাগের সুধাস্বাদ পাইলাম, তাহা এ জীবনেও ভুলিব না। কিন্তু পূর্ব্বরাগের পর মিলনের কথা না শুনিলে প্রাণে শান্তি হয় না। রামরায়,—তোমার মুখে মিলনের কথাও শুনিব।

রামানন্দ। দয়াময়, শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তিনি চিন্তায় চিন্তায় মলিন হইলেন, দেহ কৃশ হইয়া পড়িল, সারা নিশি ছট্‌ফট্ করিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—নয়নের নিদ্রা দূরে গেল। সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন—দিন দিন মূর্চ্ছা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—এমন কি কখন কখন তাঁহার শ্বাসরোধ পর্য্যন্ত হইত।

এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীমতীর দূতী শ্যামের অন্বেষণে বাহির হইলেন, তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া শ্রীমতীর সকল অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। দূতী বলিলেন, "শ্রীমতী কুসুম-শরের অত্যাচারে মৃতপ্রায়। তুমি ভিন্ন এখন আর তাঁহার অন্য উপায় নাই।"

শ্রীকৃষ্ণ দূতীর কথা শুনিয়া ভাব গোপন করিয়া বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"সে কি, এই কুসুম-শর লোকটা কে? এই দুষ্ট ওখানেই বা এলো কেন? সুনয়নী শ্রীমতী এমনই বা কি অপরাধ করিলেন যে সেই দুর্বৃত্ত তাঁহাকে এত যাতনা দিতেছে। দূতি, ও কি কংসের কেহ হয়?

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বীরভাব দেখাইয়া কহিলেন—"আমায় বলিয়া দেও, সেই দুরাত্মা কোথায়—এখনই আমি কুসুম-শরের যথোচিত শাসন করিয়া এই বালিকার যাতনা ঘুচাইব। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য যে আমি এখানে বর্ত্তমান থাকিতে ব্রজ-রমণীগণের এত ত্রাস!

বিদূষক। সখে, তুমি বুঝিতে পার নাই। এ লোকটা কংসের কেহ নয়—আমারই এক নাম কুসুম-শর। তুমি আমার গায়ে হাত দিতে পারিবে? আমি যে ব্রাহ্মণ!

কৃষ্ণ। ধিক্ মূর্খ, আর পরিহাসের প্রয়োজন নাই।

বিদূষক। ওগো, ভদ্রে, তুমি আমার কথা শুন। আমার এই প্রিয়-বয়স্যের হাতে গোটা দুই লাড়ু দাও, তা হলে আর কি তোমাদের বিপদ্ আছে। উনি এখনই সেখানে গিয়া কুসুম-শরের দর্প খর্ব্ব করিয়া দিয়া আসিবেন।

দূতী। শ্যামসুন্দর, আপনি থাকিতে শ্রীবৃন্দাবনের রমণীগণের আর অপর ত্রাস কি? আর অপর কুসুম-শর কোথা হইতে আসিবে? আপনিই শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন। আপনার দ্বারাই আমাদের সখীর এই যাতনা।

কৃষ্ণ। (আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে) বল কি, আমাদ্বারা ? এও কি কখনো হয় ? আমি গোপবালকদিগকে লইয়া এই যমুনাতটে বনে বনে বিচরণ করি। ইহারা সর্ব্বদাই আমার সাথে সাথে থাকে। আমি এই শ্যামল যমুনার শ্যামলতটের আশ-পাশ ছাড়া অন্য কোথাও যাই না। তোমার সখী কুলবধূ। তিনি আমায় দেখিবেন কি রূপে ? এ কথায় তো আমার বিশ্বাসই হয় না।

গোপ-কুমার-সমাজমিমং
সখি; পৃচ্ছকদানুগতোঽহং।
কথমিব মামনুপশ্যতি দিশি দিশি
কথমিব কলয়তি মোহম্॥
সখি পরিহর বচন-বিলাসম্।
গোপ শিশূনাং বিদিতমিদং
মম জনয়তি গুরু-পরিহাসম্॥
যদ্যপি কুলবালয়াপি কুলস্থিতি-
রনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতি বিকলা
বালে কিল করণীয়া॥

দুতি, আমার কথায় বিশ্বাস না কর, এই গোপকুমারেরা তো এখানে আছে; ইহাদিগকেই একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না, ইহারা কি বলে ? তোমার সখী আমাকে কোথায় দেখিতে পাবেন ? আর আমাকে দেখিয়াই বা তাঁহার মোহ হইবে কেন ? দুতি, তুমি অত কথা বলিও না। যদি এই সকল গোপকুমারেরা

এই কথা জানিতে পায় তবে আমার পক্ষে অতি লজ্জার কথা হইবে—উহারা আমায় কত পরিহাস করিবে। যদিচ তোমার কুলকামিনী সখী কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন; কিন্তু আমি অতি বালক—তাঁহার প্রেমের অযোগ্য। তাঁহার এ অস্থানে অনুরাগ! আমি কি করিব বল?”

শ্যামের কথা শুনিয়া দূতী একবারে নিরাশ হইলেন; ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, দেহ থরহরি কাঁপিতে লাগিল; মস্তক অবনত হইল, ধরণীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন, আর শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগের কথা মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন—সখী কি অস্থানেই প্রেম করিয়াছে। রাই অমৃত-ভ্রমে গরল পান করিয়াছে—এখন দেখিতেছি কালকূটের তীব্র জ্বালায় সখী জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিবে। হায়, আমি কি করিব? সখীর কি ভ্রম? তিনি সুশীতল চাঁদ মনে করিয়া শ্যামের প্রতি অনুরাগ করিয়াছিলেন কিন্তু এখন বুঝা গেল শ্যামচাঁদ নয়—রাহু। সখীকে গিয়া কি বলিব? শ্যামের কথা শুনিলে তাঁহার যে কি হইবে বলা যায় না।”

যাহা হউক, আবার বলিয়া দেখি—এই ভাবিয়া দূতী সজল-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া গদ্‌গদবাক্যে বলিলেন—“শ্যাম-সুন্দর—অনুগত বঞ্চনা কি উচিত কার্য্য?

কৃষ্ণ। দূতি, ও কথা আর মুখে এনো না। যদি অন্য কিছু বলিবার থাকে, তাহাই বল। এমন পাপের কথা আর মুখে তুলিও না।

দয়িতো দয়িত স্তস্যা বালেয়ং কুলপালিকা।
অকাণ্ডে কিমসৌ মুগ্ধে ধত্তামাচারবিপ্লবম্॥

জান তো দূতি, পতি-সেবাই নারীগণের পরম ধর্ম্ম। তিনি কুলবধূ, বিশেষতঃ তাঁহার স্বামী তাঁহার অতিপ্রিয়। তিনি অকাণ্ডে কেন কুলে জলাঞ্জলি দিবেন? আমি বনের রাখাল, তিনি রাজকন্যা। আমার প্রতি তাঁহার এ অনুরাগে কি সুখ! কাজের মধ্যে কেবল অকাণ্ডে কুলবিসর্জ্জন ও ধর্ম্মনাশ। এমন কর্ম্মও কি করিতে হয়! যাও, তাঁহাকে বারণ কর গিয়ে।

বিদূষক। ওগো গোয়ালা মেয়ে—আমাদের প্রিয়সখা এখন ধার্ম্মিক হইয়াছেন! তোমাদের চোখের জলে কিছুই হইবে না। বরঞ্চ দুটো লাড়ু দিতে পার তো উনি লইতে পারেন। আর কাঁদিয়া ফল নাই, এখন এথা হইতে পালাও।"

দূতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে শ্রীরাধার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল—নয়ন যুগল ছল ছল, বাক্য গদ্‌গদ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দূতী বলিলেন—সুন্দরি, কানুর অভিলাষ দূর কর। অমন নিষ্ঠুরের সহিতেও কি প্রেম করিতে হয়? কিছুতেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে না। তোমার নিদান দশার কথা আমি যে কত শুনাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার দয়া হওয়া দূরে থাকুক, সে আরও অনেক নির্দ্দয় কথা বলিল। সে সকল কথা আমি আর তোমায় কি বলিব—বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"

এই বলিতেই দূতীর মুখে আর বাক্য সরিল না,—কমলিনী

মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পড়িলেন। অনেক যত্নে তাঁহার চেতনা হইল। তখন তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—সখি, শ্যামচাঁদ আমায় উপেক্ষা করিয়াছেন ইহাও কাণে শুনিতে হইল! অসম্ভবই বা কি? আমি কি তার যোগ্যা? কিন্তু দুরাশার ত অকার্য্য নাই, প্রেমও স্থানাস্থান জানে না। এখন কি করিব বল? শ্যামচাঁদ যে দুর্লভ, তাহা আমি বুঝেছি। যখন তাঁহাকে পাওয়ার আর আশা নাই, তবে এ জীবনে আর ফল কি? মরণই ইহার প্রতিকার। সখি আমি শ্যাম-নাম জপ করিতে করিতে—ঐ শ্যামের রূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্যামল যমুনার গভীর জলে এ তাপিত জীবন বিসর্জ্জন দিব।

কিন্তু সখি, তোমরা আমার জন্য কত যাতনাই সহিয়াছ। তোমরা উত্তর কালের আরও একটি সহায় করিও। আমার দেহটীকে বৃন্দাবন ছাড়া করিও না। তমালের কান্ধে ভুজ-লতা দিয়া আমার দেহটী বাঁধিয়া রাখিও। যদি কখনও কৃষ্ণ ভুলক্রমেও দেখিতে পান,—আমার আশা পূর্ণ হইবে।"

শ্রীমতী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সখীগণ কাঁদিতে লাগিলেন। ললিতা সকলকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—এখন রোদনে ফল নাই। শ্যামচাঁদকে আনিতেই হইবে। এবার আমি যাব—না আসেন তাঁহার পায়ে মাথা কুটিব—তাঁহাকে নারীহত্যার ভাগী করিব। তোমরা শ্রীমতীর নিকটে থাক। উঁহার পরিচর্য্যা কর—দেখিও এই সময়ের মধ্যে যেন উঁহার জীবনান্ত না হয়।"

এই বলিয়া ললিতা শ্যামের অন্বেষণে বাহির হইলেন। এদিকে শ্যামসুন্দর দূতীকে বিদায় দিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন— কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি। পরিহাসচ্ছলে এমন নিঠুর কথা বলিয়া কাজ ভাল করি নাই। শ্রীরাধার হৃদয়, কুসুমের ন্যায় সুকোমল, তিনি কি এই আমার এই নিদারুণ বাক্যবাণ সহিত পারিবেন? এখন উপায় কি?"

শ্যামসুন্দর বংশীবটমূলে বসিয়া যখন এইরূপ ভাবিতেছিলেন, তখন ললিতা গিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ললিতাকে আর বেশী কথা বলিতে হইল না। শ্রীরাধিকার চরম অবস্থার কথা বলামাত্রই শ্যামসুন্দর কাঁদিয়া ফেলিলেন :—

শুনইতে কানু নয়ন-যুগ ঝরঝর
আকুল তনু-মন-প্রাণ।
গণি গণি কাতর ধৈরজ পরিহরি
বোলত নাগর কান॥
সজনি, তোহে হাম কি কহিব আর।
মঝু লাগি সো ধনী ভেলহি যৈছন
ঐছন ভেলহি আমার॥

আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া ললিতার সহিত শ্যামচাঁদ শ্রীমতীর কুঞ্জদ্বারে উদিত হইলেন। শ্যামের আগমন-সংবাদে শ্রীরাধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে সেই হৃদয়-রঞ্জন মোহন-মুরলধারী শ্যামসুন্দর!

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপে।
ঈষদবলোকনে ছল-ছল লোচন
কেলি-সমাগমে কাঁপে ॥
রাই বদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়লি গোরি।
শ্যাম-পরশ সুখে চমকি উঠয়ে ধনী
চুম্বনে বাহ মুখ মোড়ি ॥

রাম রায় মহাপ্রভুর শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দয়াময় আপনার আজ্ঞা পালন কোনরূপে হলো তো ?"

মহাপ্রভু। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! কি উজ্জ্বল মনোহর মিলন। শ্যামানুরাগের এমনই মাধুর্য্য! রামরায়, আসল কথা বলিতে কি—"রাগ" ব্যাপারটা বড় সহজ নয়। ভালবাসার আকর্ষণে ভালবাসার বস্তুতে চিত্তের আপন টানে যে পরম আবেশ তাহাই—রাগ। আবেশ বা আবিষ্টতা কি কম কথা! সকল ভুলিয়া যদি চিত্ত কোন এক বিষয়ের দিকে ঝোঁকে তাহাই—আবেশ বা আবিষ্টতা। কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তিতে সুধু আবিষ্টতা যথেষ্ট নহে—পরম আবিষ্টতা থাকা চাই—আবার সুধু পরমাবিষ্টতাও যথেষ্ট নহে—স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা চাই,—তাহাই রাগ।

অর্থাৎ ভালবাসায় চিত্তের যে স্বাভাবিক আপন টান বা আবিষ্টতা তাহা যখন চরম সীমায় উঠে তখন উহাকে "রাগ" বলা যায়। কৃষ্ণ-সঙ্গমের পূর্ব্বে কৃষ্ণের নাম-গুণাদি শ্রবণে বা

তাঁহার দর্শনে তাঁহার প্রতি যখন এইরূপ "রাগ" জন্মে, তাহাই পূর্ব্বরাগ। শ্রীভগবানের ব্রজ-লীলায় এই পূর্ব্বরাগের যেরূপ উচ্ছ্বাস দেখা যায়, অন্য কোথাও সেরূপ ভাব একবারেই দুর্লভ। রামরায়, তোমার কথায় ও স্বরূপের গানে ব্রজ-রস যেন বাস্তবিকই মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে। তোমরা আমার মর্ম্ম জান—তোমাদিগকে অধিক কথা আর কি বলিব? আমার অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে—যে এখন—"তিলে প্রাণ তিন স্থানে ধরি।"—এ অবস্থায় তোমরা নিকটে না থাকিলে আমার যে কি দশা ঘটে—বলিতে পারি না।

রামরায়। দয়াময়, আপনার চিরদাস ও আপন জন বলিয়া পদধূলিতে যে স্থান দিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? জগতের জীব ব্রজমাধুরীর কি জানিত—রাধা-প্রেমের কি বুঝিত—ব্রজ-রসের ভজন-সন্ধানই বা কোথা পাইত—যদি আপনি নিজে কলির জীবকে দয়া করিয়া এই সন্ধান না দেখাইতেন?

স্বরূপ। রায় মহাশয়, এ সকল গুহ্য কথা একটুকু চুপে চুপে বলাই ভাল। জান তো এখানেও এক শচী মা আছেন। উনি শুনিলে এখনই আপনার মুখের উপরে বলিবেন—"আপনারাই উঁহাকে অধিকতর অস্থির করিয়া তোলেন।

রামানন্দ। সে কথা অতি ঠিক্। গোবিন্দদাস বাস্তবিকই শচী মাতাঠাকুরাণীর ন্যায় মাতৃস্নেহে প্রভুর সেবা করেন, প্রভুর যাতনা দেখিলে গোবিন্দ একবারে হতজ্ঞান ও ব্যাকুল হইয়া

পড়েন। ঐ যে গোবিন্দ আস্‌ছেন। আচ্ছা—এখন আমরা একটুকু বিদায় লই—আবার সত্বরেই আসিতেছি। গোবিন্দ, তোমার প্রভু রহিলেন, বুঝিয়া লও।

গোবিন্দ। রায় মহাশয়, আমার কথা ধরিবেন না। আপনারা যাহাতে ব্রজ-রস বলিয়া আনন্দ লাভ করেন, আমার বোধ হয় উহা কেবলই যাতনা—কেবলই চোখের জল—আমি অত সহিতে পারি না।

অতঃপরে সকলেই একত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবদর্শনে গমন করিলেন।

রূপানুরাগ।

নীলাচলে রথ-যাত্রা। চারিদিক্ হইতে ভক্তমণ্ডলী সমবেত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের ভক্তগণ রথযাত্রার বহু পূর্ব্বেই শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত। রথ-যাত্রা-দর্শন তাঁহাদের উপলক্ষ মাত্র—শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্দর্শনের জন্যই সারা বৎসর তাঁহাদের প্রাণে উৎকণ্ঠা। ইহাঁরা কেবলই বৎসর ভরিয়া দিন গণনা করেন—কবে রথ-যাত্রা হইবে; আর সেই সময়ে সকলে মিলিয়া নীলাচলে যাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ—আত্মার আত্মা—শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন। তাই তাঁহারা অন্যান্য দেশীয় যাত্রীদের অনেক পূর্ব্বে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া দিন রজনী তাঁহাদের হৃদয়ের ধন শ্রীগৌর-সুন্দরকে দর্শন করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছেন।

কিন্তু তাঁহাদের দুঃখ এই যে পূর্ব্বে যেমন প্রভু তাঁহাদের সঙ্গে

মনের উৎসাহে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন—সর্ব্বত্রই মহাসঙ্কীর্ত্তন করিতেন—সর্ব্বদা হাসিমুখে কথা বলিতেন—এখন আর সে ভাবটী নাই। শ্রীমুখে যেন কেমন এক গভীর বিরহ-ব্যাকুলতা—সর্ব্বদা সজল নয়ন—মুখ খানি পাণ্ডুর। তিনি লোকজনসঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জনস্থানপ্রিয়। বহিরঙ্গ লোকের সহিত যখন নেহাত কথা না বলিলে নয় তখনই দুই একটি কথা বলেন—পরক্ষণেই মস্তক অবনত করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া অশ্রুপাত করেন।

এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণে একটুকুও সুখ নাই। গম্ভীরা মঠের সুবৃহৎ প্রাঙ্গনে ভক্তগণের যথেষ্ট সমাবেশ। নাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গও যথেষ্ট। প্রভু কিছুক্ষণ সে কীর্ত্তনে যোগ দিয়াই রোদন করিতে করিতে গম্ভীরা মন্দিরে চলিয়া যান। প্রভু জানেন যে ইহাতে ভক্তগণের ক্লেশ হয়, তাঁহাদের উৎসাহ দমিয়া যায় কিন্তু উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের মোহন রূপের ভাবচ্ছবি তাঁহার হৃদয়ে উঠে, তাঁহার প্রাণ সেই রূপ-দর্শনে ব্যাকুল হয়, এইভাবে ভাবে তিনি বিবশ হইয়া পড়েন, প্রিয় ভক্তগণের প্রতি সকল সময়ে সমান দৃষ্টি রাখার সামর্থ্য আর থাকে না।

ভাবাবেশের পরে যখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েন, তখনই অতি কাতরকণ্ঠে তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন—"তোমরা সকলে কত ক্লেশ সহিয়া এখানে আসিয়াছ, আর আমিও সারা বৎসর রথ-যাত্রার আশায় আশায় থাকি—তোমরা আসিবে তোমাদিগকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিব—নামকীর্ত্তন

করিব—তোমাদের সঙ্গ করিব। সেই তোমরা আসিয়াছ, কিন্তু এই দেখ আমার কি হইয়াছে—আমার প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল—আমার মন আর আমাতে নাই—ভাল করিয়া দুইটি কথা বলিতে পারি না। অতি প্রিয়জনের সঙ্গও ভাল লাগে না, সকল ছাড়িয়া বিরলে বসিয়া কেবলই কাঁদিতে ইচ্ছা হয়—চেষ্টা করিয়াও নয়ন-জল সংবরণ করিতে পারি না। মনে করি মনের ভাবে চাপা দিয়া তোমাদের সহিত হাসিমুখে দুইটি কই—কহিয়া তোমা-দিগকে সন্তুষ্ট করি, কিন্তু কি করিব—হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া-ফেলি।

কি-যে-এক অপরূপ রূপের ঝলক আমার নয়ন সমক্ষে ক্ষণে ক্ষণে আসিতেছে, আবার তখনই চলিয়া যাইতেছে—তাহাতে আমি অস্থির হইয়া পড়িতেছি। এ কথা বলিবার নয়—লুকাই-বারও নয়; এই রূপটি আমায় চিত্ত টানিয়া লইতেছে। উহা কি মধুর—কি সুন্দর—উহার কি আকর্ষণী শক্তি? ভক্তগণের সঙ্গে অনন্যমনে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিব—এই আশায় সংসার ছাড়িয়া আসিলাম—তোমরা আমার প্রাণের প্রিয়, কৃষ্ণ-ভক্ত—তোমাদের সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে আমার কত সুখ, আর সেই তোমরা আসিয়াছ—আর আমার অবস্থা দেখ—কৃষ্ণনাম করিব কি—ও নাম শুনিলেই আমি অধীর হইয়া পড়ি—মনে হয় বিরলে বসিয়া কেবল উহার সেই ভুবন-ভুলান বঙ্কিম নয়নের কি-জানি-কেমন এক ইঙ্গিতের মত সেই কটাক্ষের ধ্যান করি। আসল কথা বলিতে কি—ঠিক যেন সেই নয়নের কটাক্ষে আমায় ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ

চলিয়া যায়—আর আমি তাঁহার জন্য পাগল হইয়া রোদন করি।" সে এমন করে কেন? অই দেখ—ঐ সে—"

বলিতে বলিতে প্রভু উত্তান নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া বাহ্য-জ্ঞান হারা হইলেন—বজ্রাহতের ন্যায় শ্রীঅঙ্গ নিস্পন্দ ও নিশ্চল হইল।

বসু রামানন্দ, শিবানন্দ ও মুকুন্দ তাড়াতাড়ি প্রভুকে ধরিয়া বক্ষে লইলেন, তাঁহার মস্তক মুকুন্দের স্কন্ধে ঢুলিয়া পড়িল—নয়নযুগল সেই উত্তান ভাবেই রহিয়াছে—বাম নয়ন ঈষদ্ বক্র, নয়নের তারা স্থির অথচ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত—মুখমণ্ডল ভীষণ পাণ্ডুর—শ্বাস-রুদ্ধ।

অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ বক্ষে করাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কাশীশ্বর ভক্তগণকে অনুনয় করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আর বলিলেন—আপনারা এরূপ দেখিয়া সহিতে পারিবেন না—অল্পক্ষণের জন্য বহিরাঙ্গিনায় যাইয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন আরম্ভ করুন।" কাশীশ্বরের কথায় ভক্তগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বাহির আঙ্গিনায় যাইয়া ব্যাকুলভাবে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—একরূপ বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শিবানন্দ সেন প্রভুর মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না, মুখ বাঁকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথায় বাতাস দিতে লাগিলেন। স্বরূপ বলিলেন, "কাশীশ্বর তুমি ভাল করিয়া প্রভুকে ধরিয়া বসো, মুকুন্দকে অবকাশ দাও। মুকুন্দের প্রয়োজন আছে।"

কাশীশ্বর অতি যত্নে প্রভুকে নিজের বুকে ধরিয়া লইলেন। স্বরূপ ও মুকুন্দ মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণ নাম জপ করিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নাসিকার অগ্রে তুলা ধরিয়া দেখিলেন নাসিকায় মৃদুভাবে শ্বাস বহিতেছে, নয়নের তারা নামিয়াছে—উত্তান ভাবও অনেকটা কম হইয়াছে। আবার উভয়ে সমস্বরে চেতনার মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নে জলবিন্দু ও ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে অশ্রুবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু নয়নযুগল হইতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মুকুন্দ দত্ত স্বরূপকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন,—প্রভুর ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

একজন ভক্ত তাড়াতাড়ি বাহির অঙ্গনে গিয়া ভক্তগণকে সংবাদ দিলেন—"আর চিন্তা নাই প্রভুর চেতনা লক্ষণ দেখা যাইতেছে, আপনারা খুব কীর্ত্তন করুন।" ভক্তগণ নাম-কীর্ত্তন ছাড়িয়া এক নূতন পদ গাইতে লাগিলেন—

যো মুখ জিতল কমল অতি নিরমল
সো অব হেরি সে মৈলান।
যো বর অধর বিম্বফল নিন্দল
তছু রাগ হেরি আন ভান॥

গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী
নিরবধি ঝুরয়ে নয়ান ॥
কাঞ্চন বরণ মলিন হেন হেরইতে
মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়।
কহ সই যুকতি যাহে পুন গৌরকো
বিরহকো তাপ পলায় ॥

ভক্তগণ নয়নজলে বুক ভাসাইয়া এই গান গাইতে লাগিলেন। গানটি শেষ হইতে না হইতেই বসু রামানন্দ ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান ধরিলেন :—

আরে মোর গৌর-কিশোর।
সহচর কন্ধে পহুঁ ভুজ-যুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর ॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌরহরি কাহে হায় মরি মরি
তন্তুক দোসর ভেল দেহ ॥
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোঅয়ে হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া।

শত শত শ্রোতা কীর্ত্তন শুনিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন।

পুলক, কম্প, স্তম্ভ, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারে গায়ক ও দর্শক-বৃন্দ সকলেই ব্যাকুল। শ্রীমন্দিরে স্বয়ং ভাবময় বিগ্রহ যে ভাবে বিভাবিত—বাহির অঙ্গনে তাঁহারই প্রিয় ভক্তগণের সেই ভাবময় কীর্ত্তনে ভাবরস একবারে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর চেতনার সঞ্চার হইল। তিনি মৃদুস্বরে স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়া বলিলেন, "স্বরূপ,—কি দেখিলাম—আ-মরি মরি—কি মধুর! কি মধুর!

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

স্বরূপ— কৃষ্ণের মাধুর্য্য হয় অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর
তার যেই স্মিতজ্যোৎস্নাভর॥

কি সুন্দর! কি সুন্দর! কি মন-মাতানো মধুর রূপ!

মারঃ স্বয়ং নু মধুর-দ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু

বেণীমৃজো মু মম জীবিতবল্লভো মু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়।

স্বরূপ,—শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল ঠিক বলিয়াছেন—"এ রূপ দেখিয়া প্রথম ভাবিলাম এই বুঝি স্বয়ং কন্দর্প। যিনি রূপের ছটায় ত্রিভুবন শাসন করেন, ইনি বুঝি সেই মহামারক কামদেব। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, ইনি মারক কন্দর্প নহেন—ইহাতে পূর্ণমাধুর্য্য বিরাজমান্—যেন এক মধুরত্যুতি-মণ্ডল। মারক মদনে এ মাধুর্য্য কোথায়? তাপরে মনে হইল—ইহাকে মাধুর্য্যদ্যুতি বলিয়াই বা বলি কেন—ইনি স্বয়ংই মাধুর্য্য। তাই বা বলি কেন—ইনি মন ও নয়নের অমৃত। পরে বুঝিলাম—ইনি শ্রীরাধার সেই মনচোরা বেণীমোচক জীবিতবল্লভ নবকিশোর মোহনমুরলীধর ব্রজ-জন-নয়ন-রঞ্জন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ।

স্বরূপ, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের এমন বিজুরি চমকে আমি যে কোন্ অমৃতসাগরে ভাসিয়া গিয়াছিলাম তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না।"

প্রভুর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অতীব আগ্রহ সহকারে স্বরূপ গান ধরিলেন :—

বিকচ সরোজ ভাণ্ডমুখ-মণ্ডল
দিঠি-ভঙ্গিম-নট-খঞ্জন যোর।
কিয়ে মৃদুমাধুরী হাস উগারই
পিই পিই আনন্দে আঁখি
পড়ল বিভোর।"

মহাপ্রভু স্বরূপের মুখে হাত দিয়া গানে বাধা দিয়া বলিলেন—স্বরূপ, একটু থাম। আমি দেখিয়া লই—

"বিকচ সরোজ ভঙ্গিমুখমণ্ডল"

আর তাহার উপরে—

"দিঠি-ভঙ্গিম-নট-খঞ্জন যোর"

নয়নযুগল খঞ্জনের ন্যায় নৃত্যশীল। এই বঙ্কিম নয়নের কটাক্ষ-নৃত্যেই তো আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি। যদি আমি তাহার নয়ন সঙ্কেত না বুঝিতাম, যদি এমন ভাবে তিনি আমার পানে না চাহিতেন, তবে মনে হয় আমার এমন দশা হইত না।

আর সেই মুখখানির মৃদুমধুর হাসি--সে ত অমৃতের খনি।"

"পিই পিই আনন্দে আখি পড়ল বিভোর!"

হাঁ—হয়েছে স্বরূপ,—ঠিক্—অতি ঠিক্ কথা। আমি ভাবিয়াছিলাম তোমায় বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তা—তুমি বুঝেছ—ঠিক বুঝেছ। তবে গাও—আবার গাও—তারপর?

স্বরূপ। বুঝি নাই—কিছুই বুঝি নাই। তবে গান গাইতে পারি সেও তোমারি কৃপা। তারপরে এই :—

বরণি না হয় বরণ চিকনিয়া
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া।
অঙ্গদ বলয়া হারমণি কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিনী বসনা।

আভরণ বরণে অঙ্গহি ঢর ঢর
কালিন্দী জলে যৈছে চাঁদ কি চলনা।
কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলী
শোভে মদন শিখি চাঁদক ছাঁদে।

স্বরূপের গান শেষ হইতে না হইতেই গৌড়ীয় ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির আঙ্গিনা হইতে ভিতরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। বর্ষার জলপ্লাবন যেমন স্থান-অস্থানের বিচার করে না—পথ পাইলেই সর্ব্বত্র প্রবেশ করে—গৌড়ীয় ভক্তগণও গম্ভীরা ভিতরে কি হইতেছে, তাহার কোনও বিচার না করিয়া ভাব-রসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রূপমাধুর্য্যের বর্ণনাময় সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে বিভোর হইয়া সেই শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের জন্য ভিতরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন।

প্রভু ব্যাকুল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলেন, ভক্তগণ তাঁহাকে মধ্যে লইয়া তাঁহারই রূপ-মাধুর্য্যের গানের ধুমায় বিভোর ছিলেন। ভাব-বিভোর শ্রীগৌরচন্দ্র প্রথমতঃ উহার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, পরে বুঝিলেন—উহারা তাঁহারই কথা বলিতেছেন—আর অমনি হস্তদ্বারা উভয় কর্ণ রুদ্ধ করিয়া দন্তে জিভ্ কাটিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহাপ্রভু অতি দীনের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া ইঙ্গিতে ভক্তগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। ভক্তগণের

কীর্ত্তনটি প্রায় শেষ হইয়াছিল—তাঁহারা অচিরেই গানটি শেষ করিয়া মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অতি দীনের ন্যায় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন জগতের পরম অমৃত—বৃথা কথা সেই কীর্ত্তনে শোভা পায় না—উহা শুনিলেও অপরাধ। তোমরা আমার চিরবান্ধব, যাহাতে আমার হিত হয়, যাহাতে আমি শান্তি পাই, তোমরা সেই কৃষ্ণকথা বল—তাহা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার শান্তি নাই, আনন্দ নাই। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে আনন্দ করিব—সে দিন আর এখন আমার নাই। নিঠুর যে আমায় এমন উন্মাদ করিবে, আমি কখনও তাহা ভাবি নাই। কি করিতে কি করি. কি বলিতে কি বলি—সকলই যেন উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। আমি যদি তোমাদের কোন যত্ন করিতে না পারি, মনে করিও না যে তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা নাই—যদি তোমাদের সহিত কথা না বলিয়া নির্জ্জনে পড়িয়া থাকি—ভাবিও না, যে আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন। আমি এখন আমার নিজের ইচ্ছার অধীন নই। তোমরা দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, যেন আমি তাঁহার দেখা পাই।"

এই বলিয়া প্রভু অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন, ভক্তগণ প্রভুর রোদন দেখিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইলেন। রামরায় ও স্বরূপ ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থির করিলেন। সকলেই সুস্থভাবে উপবেশন করিলেন।

মহাপ্রভু প্রফুল্লভাবে বলিলেন, আজ দুই রামানন্দকে একত্র

পাইয়াছি। বসু রামানন্দ কুলীনগ্রামবাসী। কুলীনগ্রাম—ভক্তির পবিত্র ক্ষেত্র

——কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন বহুদূর॥
কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহন না যায়।
শূকর চরায় ডোম—সেহ কৃষ্ণ গায়॥

বসু রামানন্দ ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—"দয়াময়, সে তো তোমারই কৃপা।"

মহাপ্রভু। রামবসু, মনে হইতেছে যেন যুগযুগান্ত চলিয়া গিয়াছে, তোমার মুখে গান শুনি নাই। তোমার সেই রূপানু-রাগের পদটী আমি এখনও ভুলি নাই। সেই "মনু মনু শ্যাম অনুরাগে"।—স্বরূপ, বসু রামানন্দের এই পদটি অতি মধুর। তুমি শুনিয়া রাখ।

স্বরূপ। বেশ কথা—বসু মহাশয়, আপনার রচিত সেই গানটি আমাদিগকে এখন শুনাইতে হইবে।

রামানন্দ বসু লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। স্বরূপ বলিলেন, "ইহাতে আবার লজ্জা কি ? বিশেষতঃ প্রভুর আদেশ।" বসু মহাশয় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিয়া মৃদুকণ্ঠে গান ধরিলেন—সঙ্গে সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত।

মনু মনু শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

জীতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
শ্যাম শেল পশিল মোর বুকে।
টানিলে নাহিক যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকি ধিকে ॥

মহাপ্রভু বক্ষে হাত দিয়া মস্তক অবনত করিয়া গান শুনিতেছিলেন—নয়নযুগল হইতে বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রুমালা প্রবাহিত হইতেছিল। স্বরূপ ও রামানন্দ রায় বিস্ফারিত নেত্রে বসু মহাশয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইতে ছিলেন। গায়কের নেত্র-যুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, কণ্ঠ গদ্‌গদ হইয়া পড়িল, মুকুন্দ দত্ত তান ধরিয়া গাইতেছিলেন, কিন্তু আর কণ্ঠ স্থির রাখিতে পারিলেন না, —কিয়ৎক্ষণের জন্য একবারেই নীরব।

আরও কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু মস্তক উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"তার পর" ?

রামানন্দ নয়নজল মুছিয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আবার গান ধরিলেন :—

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হয়ে অধরে মুরলী লয়ে
দাঁড়াইয়ে তেরছ নয়নে।
অঙ্গুলী দোলায়ে শ্যাম কি কথা কহিল গো
সদাই তাহাই পড়ে মনে ॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাইত্রে ধরি।

বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরে মরি মরি ॥

বসু রামানন্দ পদটীর শেষ তান এমন ভাবে পরিসমাপ্ত করিলেন যে উহার ঝঙ্কার শ্রোতাদের হৃদয়ে ভাব-তরঙ্গের সঞ্চার করিয়া দিল।

প্রভু বলিলেন—"রাম বসু, যোগীরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যোগ করেন; অভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা ও তন্ময়তার সাধন করেন—উহাতে অনেক স্থলেই প্রাণের টান নাই—চিত্তের উপর অস্বাভাবিক বল প্রয়োগ করিয়া চিত্তকে ভগবানের দিকে ফিরাইতে হয় কিন্তু মন স্বভাবতঃই চঞ্চল ও বলবৎ। যোগী যতই কেন বল প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করুন না, কিন্তু অনেক সময়েই চিত্ত সে দিকে যায় না। দুষ্ট অশ্ব যেমন অশ্বারোহীর ইচ্ছা মত চলিতে চায় না—অপর পক্ষে বেশী তাড়না করিলে হঠ করে—অশ্বচালককে উল্টাইয়া ফেলিতে প্রয়াস পায়, দুষ্ট চিত্তও সেইরূপ যোগে বশীভূত হইতে চায় না, বরং বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু ব্রজ-বালাদের ভাব দেখ,—প্রাণের কেমন স্বাভাবিক টান! "দিবানিশি নাহি জানি, গোপতে গুমরে মরি মরি"—ধন্য শ্রীকৃষ্ণের রূপ—আর ধন্য গোপীপ্রেম! প্রাণের স্বাভাবিক টান না থাকিলে মধুময় ভগবানের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না। কেবল ব্রজ-রসেই এ সম্বন্ধে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিন রজনীই "কানু পড়ে মনে।"

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যাম-রূপ-খানি ॥

রূপের আকর্ষণ—বড় গুরুতর আকর্ষণ।

রামরায়।—দয়াময় এই যে এজগতে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ভুবনমোহনরূপ প্রকাশ করেন, তাহার উদ্দেশ্য স্বীয় ভক্তগণের চিত্ত অধিকতর আকর্ষণ করা ও তাঁহাদিগকে সুখ দেওয়া। এই লক্ষণ দেখিয়াই স্বয়ং ভগবানের অবতরণ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ আপনার রূপ দেখিয়া আপনি চমকৃত হন—"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার"—মদনকে মোহিত করিয়া যিনি মদনমোহন নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—তাঁহার রূপের আকর্ষণ সহজেই চিত্ত তাঁহার শ্রীচরণ নামে আকৃষ্ট হয়।

মহাপ্রভু। তাই মনে হয়,—রূপানুরাগ মহাসাধনার ফল।

রাম রায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলে সেই মদনমোহনরূপ দেখিতে পায় না। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দেখিলেন, কংস সে রূপের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইলেন না। কংসের চক্ষে সেই শ্রীকৃষ্ণ-রূপই যমের ন্যায় মহাভীষণ বলিয়া বোধ হইল। আবার স্বয়ং ব্রজে ও ভেদ-দর্শন বড় কম নহে—স্নেহময়ী মা যশোদার বাৎসল্য ভাব; সে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-রূপদর্শন,—আর মধুর ভাবের রস-আস্বাদনময়ী ব্রজ-বধূগণের শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শন—স্বতন্ত্র;—কাহারও নিকটে ইনি দুধের গোপাল—স্নেহের ধন—আবার কাহারও নিকটে শ্রীশ্রীমদনগোপাল—মধুরারতির উপাস্য মধুরোজ্জ্বল শৃঙ্গার-রসামৃত মূর্ত্তি! ভাব-ভেদেই রূপভেদ,—তারতম্যও যথেষ্ট!

মহাপ্রভু। হিরণ্যকশিপুর ভাব কি ভীষণ—তাঁহার জন্য ভয়ানক নৃসিংহরূপের প্রকাশ।

রামরায়। হাঁ প্রভু। তবুও রূপের প্রকাশ! উহা যতই ভয়ানক হউন না কেন? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের দুর্ভাগ্য দেখুন,—তাঁহাদের জ্ঞানে শ্রীভগবানের কোনও রূপের প্রকাশ নাই।

মহাপ্রভু। দুর্ভাগ্য বই আর কি? যাঁহারা সবিশেষ ব্রহ্মবাদী, তাঁহারাও জানেন যে ব্রহ্ম "সত্যং শিবং সুন্দরম্" জীবে ও জগতে ব্রহ্ম-শক্তিরই বিকাশ। যাঁহার শক্তি-বিকাশেই এই জড়জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য—তিনি না-জানি-কত সুন্দর—সবিশেষ ব্রহ্মবাদীদের এক শ্রেণীর সাধক জগতের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দেখিয়াই ব্রহ্ম-সৌন্দর্য্যের অনুমান করেন। জগতের সৌন্দর্য্য মানুষের নয়ন-গোচর হয়। মানুষ আকাশের নীলিমায়, নিশার চন্দ্রিমায়, পাখীর পাখায়, কুসুমের সুষমায় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করে,—এ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কোথা হ'তে আসিল,—বায়ুতে কাহার সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, অনন্ত কিরণজালে কাহার রূপ মানুষের নয়ন-সমক্ষে খেলা করিতেছে—একটুকু চিন্তা করিলেই মানুষ আপন হৃদয়ে তাহার আভাস পায়। কিন্তু এই সুন্দর জগৎ যে চিরসুন্দরের লীলা, সেই গোপী-হৃদয়-রঞ্জনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সাক্ষাৎ অনুভব বাস্তবিকই সুদুর্ল্লভ।

রামরায়। হাঁ প্রভু, এক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তির তত্ত্ব-কথায় অনেক সময়েই শ্রীরূপ-সাধনার মাধুর্য্য দূরে সরিয়া যায়। তাঁহারা বলেন "তিনি অনন্ত—তিনি অপরিসীম—তিনি সর্ব্বব্যাপী",—সকল কথাই সত্য। কিন্তু এই সকল ভাব হৃদয়ে লইয়া সাধনায় বসিলে রূপের সাধন চিত্তে স্থান পায় না—রূপানুরাগ তো দূরের কথা।

সসীম আমি—অসীমকে পাইব? ক্ষুদ্র আমি—অনন্তের সহিত কি করিয়া সম্বন্ধ পাতাইব? অনন্ত অনন্তভাবে ব্যাপ্ত। আমি কি করিয়া তাঁহাকে টানিয়া আপন করিব?

ব্রজবধূগণের রূপানুরাগ যে সিদ্ধাবস্থারও চরম ফল, সে ধারণা এই শ্রেণীর সাধকদের নাই। নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে শুষ্ক জ্ঞানী সন্ন্যাসী আমাদের স্বরূপ ঠাকুরের গান শুনিয়া একবার গলিয়া গিয়া বলিয়াছিলেন—"যিনি এমন সুন্দর, তাঁহাকে যদি হৃদয়-সখা প্রাণপ্রিয়তম ও প্রাণবল্লভ বলিবার অধিকার না পাইলাম, তবে সাধনায় সুখ কি? যিনি এত সুন্দর, তিনি এত মধুর—এত সরস! তিনি "অরূপ ও নিরাকার" এ কি ভীষণ সত্য! এ হৃদয়ে ভালবাসার স্রোত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনাও অবিরামবেগে ছুটিয়াছে। তাহা তো রোধ করিতে পারি নাই—জগতের অনন্ত বস্তুতে সেই সৌন্দর্য্যের প্রভা ও মাধুর্য্যের আভা প্রকাশ পাইতেছে। সেই ব্রহ্ম হইতেই এই সুন্দর মধুর জগতের উৎপত্তি। তিনি আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপ—আর তিনি কি নিজে অরূপ—নিরাকার? এই জাতীয় ভাব-সাধনায় নমস্কার!" সন্ন্যাসী এই বলিয়া স্বরূপের চরণতলে গড়াইয়া পড়িলেন।

মহাপ্রভু। এই ব্যক্তিটীতো বড় ভাগ্যবান্! তার পর?

রামরায়। তার পর তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত অনেক প্রকার তর্ক করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদিগকে তিনি শাস্ত্রতর্কে নিরস্ত করিয়া বলিলেন—"তোমাদের জ্ঞান লইয়া তোমরা যতক্ষণ

৭

নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম বিচার করিবে, শুষ্ক জ্ঞানের মরুভূমিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধ হইবে, ততক্ষণ আমি এই প্রেমিক ভক্তগণের সুধাময় সঙ্গীতে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মধুর রূপ সন্দর্শন করিয়া আনন্দ সুধায় ডুবিয়া থাকিব। তোমাদের এই জ্ঞানের আলোক লইয়া তোমরা দূরে থাক, উহাতে চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া উহার দিব্য দর্শন-শক্তি নষ্ট করিবে। ভক্তের ভগবান আপন দেহের মধুর জ্যোতিতেই প্রিয়তম ভক্তের নিকট আত্মরূপ প্রকাশ করেন, সেরূপ দেখিয়া তাঁহারা আনন্দরসে বিভোর হন। তোমাদের জ্ঞান দিব্যজ্ঞান নয়,—মানুষের জ্ঞান—তর্কনিষ্ঠ জ্ঞান, উহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। রূপানুরাগের গানে যে জ্ঞান হয়, তাহার নিকট এই জ্ঞান কিছুই নয়—তাহা অপেক্ষাও খারাপ—উহা অন্ধকার বিশেষ। তোমাদের অই জ্ঞান যখন সীমা ছাড়ে, তখন অসৎ কল্পনায় মিশিয়া আত্ম-হারা হয়।”

“তোমাদের শুষ্ক তর্ক তোমাদিগকে মরুভূমিতে রাখিয়াছে, কিন্তু এই ভক্তগণ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাগরের এক বিন্দু সুধালাভেও কৃতার্থ হয়েন—আমি বুঝিয়াছি সাধনার ইহাই পরম পুরুষার্থ। তোমরা ইহাকে অন্ধবিশ্বাস বল, অজ্ঞান বল বা কুসংস্কার বল কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের বলে যিনি শ্রীভগবানের ভুবন-মোহন রূপানুরাগে বিভোর হইয়া সেই রস-স্বরূপ শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন তাঁহারাই মহাপুরুষ। আমি সেই মহাপুরুষকে লাভ করিয়াছি, আর তোমাদের তর্কের কচকচিতে থাকিব না।”

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সুলক্ষণ বটে, উদ্দেশ্য ফলিতেছে। ভাল, রামরায় তার পর?"

রামানন্দ। তার পরে শুষ্কজ্ঞানীর দল আমাদের স্বরূপঠাকুরকে ঘেরিয়া বসিয়া গেলেন, বলিলেন—"ঠাকুর, এই রস-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের আরও একটি গান শুনাইতে হইবে।" স্বরূপ গম্ভীরভাবে বলিলেন, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণরেণু-লাভের পূর্ব্বে এ গান শ্রবণের অধিকার জন্মে না। তোমরা প্রথমে তাঁহার চরণরেণু গ্রহণের অধিকারী হও। পরে এ গান শুনিতে পাইবে।"

সন্ন্যাসীরা সেদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আপনার চরণরেণুতে মাথা বেচিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "রামানন্দ, গঙ্গা-প্রবাহে কূপজলে মিশাইবার কি প্রয়োজন? তুমি রূপানুরাগের কথাই বল"।

রামরায় মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন "প্রভু, আপনার চরণ-দর্শনের পূর্ব্বে এ সকল কথার কিছুই বুঝিতাম না। তবে শ্রীভগবানের রূপে যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, সে কথা শুনিয়াছিলাম। শৈশবে অভ্যাস করা একটী শ্লোক বহুকাল পরে মনে পড়িল। আমি তখন খুবই শিশু। পিতৃদেব বহু বহু গ্রন্থের ভাল ভাল পদ্যগুলি বাছিয়া বাছিয়া আমায় মুখস্থ করাইতেন। সেই সময়ের একটী পদ্যের অর্থ ক্রমেই আমার নিকট অধিকতর উজ্জ্বল হইতেছে। পদ্যটী মহানাটকের। এক পদ্যেই প্রশ্নোত্তর। কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিতেছেন:—

আনীতা ভবতা যদা পরিণীতা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা।
স্ফুর্জ্জদ্ রাক্ষস মায়য়া নচ কথং রামাঙ্গমঙ্গীকৃতম্?

ধরিত্রীসুতা ক্লেশ-সহনশীলা সীতাদেবী বিবাহিতা, তাহাতে অতি সাধ্বী; শ্রীরামভিন্ন অন্য কোনও পুরুষই যখন সীতার গ্রহণীয় নয়—এ অবস্থায় রাক্ষসী মায়ার সাহায্যে রামের রূপ ধারণ করিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিত না। তুমি তাহা না করিলে কেন?

ইহার উত্তরে রাবণ একটি মহাসত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন "ভাই সে যুক্তিটী আমার মনেও উঠিয়াছিল, চেষ্টাও করিয়াছিলাম—কিন্তু বিপরীত ফল দাঁড়াইল—

কর্ত্তুং চেতসি রামরূপমমলং দুর্ব্বাদলশ্যামলং
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরং পরবধূসঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ।

"রূপধারণ করিতে হইলেই সে রূপের ধ্যান করিতে হয়। আমি রামরূপ ধারণ করিব বলিয়া সেই দুর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ চিন্তা করিতে যাওয়া মাত্রই পরমপদ যে ব্রহ্মপদ, তাহাও আমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল; পরবধূ-সঙ্গ-প্রসঙ্গতো অতি তুচ্ছ কথা।" প্রভু আপনার চরণরেণু লাভের পর হইতে এই পদটীর মর্ম্ম বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রীভগবানের রূপ-ধ্যানের এমনই শক্তি বটে।

মহাপ্রভু। সত্য সত্যই রাম রায়, তুমিই রূপানুরাগের মর্ম্ম বুঝিয়াছ। রূপানুরাগের হোমানলে তোমার হৃদয় চির শুদ্ধ, চির পবিত্র ও নিত্য বিশুদ্ধ রসময়। ইতর রাগ দূরে ফেলিয়া শ্রীভগ-বানের মধুর রূপানুরাগ তোমার হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে

বলিয়াইতো তুমি নির্ব্বিকার। একমাত্র এই ঔষধেই ইন্দ্রিয়-লালসা-কাল-সাপ তোমার ত্রিসীমাতেও ঘেঁসিতে পারে না। আমি যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেই, আমারও তোমার ন্যায় অধিকার নাই।

রামানন্দ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"প্রভো! যদি প্রতি কথাতেই এইরূপ করিয়া অপদস্থ করেন, তা হইলে চরণ-সমীপে একবারে নীরব থাকাই ভাল।"

স্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"রায় মহাশয়, প্রভু অন্যায় কথা কি বলিয়াছেন? যে মহাপুরুষ এমন নির্ব্বিকার চিত্তে যুবতী দেবদাসীকে ব্রজভাব শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিতো আমরা আর দ্বিতীয় দেখিতে পাই নাই। প্রভু যথার্থই বলিয়াছেন—

এক রামানন্দের হয় ঐছে অধিকার।
তাইতো জানি অপ্রাকৃত শরীর তাঁহার॥

এরূপ না হইলে কি ব্রজরস-আস্বাদনের অধিকার জন্মে? তিনি যে আপনার দ্বারা রূপানুরাগের তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন—প্রকৃতই আপনি উহার যোগ্য ব্যক্তি। সাক্ষাৎ মদনমোহনের রূপ যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরণ করে তিনিই ব্রজরসের ভজনার অধিকারী।"

রামানন্দরায় মস্তক অবনত করিয়া দুই হাতে কর্ণরোধ করিলেন।

প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "রামরায় আমি ন্যায্য কথাই বলিয়াছি। স্বরূপ আমার কথা ঠিক বুঝিয়াছে। ভক্তগণও তোমার মুখেই রূপানুরাগময়ী কৃষ্ণকথা শুনিবেন। যাঁহারা ব্রজরসে রূপ-সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে তোমার ন্যায় ইন্দ্রিয়-লালসা-লেশ বর্জ্জিত হইতে হইবে এবং আত্মেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা ত্যাগ করিতে হইবে, তবে এই সকল কথা শ্রবণের অধিকার জন্মিবে।"

গৌড়ীয় ভক্তগণ বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই গম্ভীর উপদেশ শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে এক বিপুল বিপ্লব উপস্থিত হইল। কাহারও কাহারও মনে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য সকলেই নীরব রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু কোমল মধুরকণ্ঠে বলিলেন,—রামরায় নানাকারণে জনসঙ্গে আমি এখন আর দীর্ঘকাল থাকিতে পারি না। ইহাতে অনেক কথা উঠে। কৃষ্ণকথায় বাধা পড়ে। ইতর রাগ থাকিলে পূর্ব্বরাগ বা অনুরাগের কথা বিড়ম্বনা মাত্র। সকলের নিকট শ্রীভগবৎরূপ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্রই পতিত হয়, কিন্তু স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইলে উহা যেমন নেত্রানন্দজনক বিবিধ বর্ণবৈচিত্র্যে সুন্দর দেখায়, মাটীর পাত্রে উহার সে প্রকাশ অসম্ভব। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে বলা হইয়াছে।

ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতেঃ
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥

তিনি অনুগ্রহ করিয়া দেখা না দিলে আমাদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতিও তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

শ্রীভগবানের রূপ সন্দর্শন,—অনন্ত সাধনার ফল। প্রাকৃত নেত্রে তাঁহার সন্দর্শন অসম্ভব। তিনি নিজের প্রকাশতত্ত্বশক্তি দ্বারা নিজের ইচ্ছায় ভক্তের নেত্রগোচর হইয়া থাকেন।

ততঃ স্বয়ং প্রকাশতত্ত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্র-বিষয়ত্বতঃ॥

শ্রীভগবান্ অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মের অর্থ আর কিছুই নয়, লীলায় লোকের নয়নগোচর হওয়া। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন। অচিন্ত্যশক্তিবলে এই পরিচ্ছিন্নতায় তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতার কোনও বাধা হয় না। যাঁহার অন্তর ও বাহির পূর্ব্ব ও অপর সকলই এক, তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপকতা ও পরিচ্ছন্নতা কেবল লৌকিক প্রতীতিমাত্র। তাঁহার প্রভাব অচিন্ত্য, তিনি আপন ইচ্ছায় আপনি প্রকাশিত হয়েন। তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ-ধর্ম্ম বিরাজমান। তাঁহার কৃপাতেই জ্ঞানী ব্রহ্মবাদিগণ এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।

রামরায়। দয়াময় রূপের সাধনায় চিত্ত যেরূপ শ্রীভগবানে অভিনিবিষ্ট হয়, অপর কোন সাধনায় সেরূপ অভিনিবেশ হয় না। ব্রজ-রসের সাধনায় রূপানুরাগ অতি প্রবল সহায়। শ্রীভগবানের মধুর রূপ নিজের বলেই সাধক চিত্তকে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে টানিয়া লয়। শেষে এই দাঁড়ায়ঃ—

পাশরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
বল সখি কি করি উপায়।

মহাপ্রভু। সে এক বিষম জ্বালা, চণ্ডীদাস শ্রীমতীর কথায় যথার্থই বলিয়াছেন :—

আমি চাই ছাড়াইতে সে না ছাড়ে চিতে
উপায় করিব কি !

রামরায়, শেষে এ রোগের ঔষধ খুঁজিয়া মিলে না,—ইহাতে কেবলই অশ্রুপাত,—কেবলই হাহাকার, রূপানুরাগের চরমফলে এইতো অবস্থা।"

মহাপ্রভুর বাক্য শেষ হইতে না হইতে তাঁহার ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ভাবে ভাবে দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উত্তোলন করিয়া মধুরকণ্ঠে গান ধরিলেন—

কানড় কুসুম জিনি কালিয় বরণখানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ জাতি কুলশীল লাজ
মরিবে কালিয়া অনুরাগে।
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো
হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আন ছান ধক্ ধক্ করে প্রাণ
কি হয় রহিতে নারি ঘরে॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে জ্বলে তনু
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু।

স্বরূপের ভাবময় গানে ভক্তগণের হৃদয়ে মহাভাবময়ীর রূপানুরাগের ভাবচ্ছবি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল। রামানন্দ বলিলেন, "প্রভু দিনযামিনী রাশি রাশি কথা বলিলেও স্বরূপের গানের সহিত তুলনা হয় না। ব্রজ-রসটীকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে কেবল এক স্বরূপ ঠাকুরের গানেই সমর্থ। সেদিন আমার পিতৃদেব (ভবানন্দ রায়) রাসের একটি পদ্য ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; সে পদ্যটি এই ঃ—

কা স্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃতবেণু-গীতং
সম্মোহিতাচার্য্য-চরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগা পুলকান্যবিভ্রন্॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! ত্রিলোকের মধ্যে এতাদৃশী স্ত্রী কে আছে যে তোমার কলপদামৃতবেণু-গীতে বিমোহিত হইয়া এবং ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্যস্বরূপ এইরূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়। কেন না, তোমার বেণু-গীতে ও রূপ-মাধুর্য্যে মৃগ-পক্ষী, এমন কি, তরু প্রভৃতিও অঙ্গে পুলকধারণ করে।

স্বরূপ ঠাকুর সেখানে ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গান ধরিলেন—

মরকত মঞ্জু মুকুর-মুখ-মণ্ডল-
মুখরিত-মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী শাখীকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান॥

উনি যেমন এই পদ ধরিলেন, আর অমনি উঁহার সুরের

ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, আমরা যেন ঠিক যমুনা-তটান্তে ব্রজকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া সেই মরকত-মঞ্জু-মুকুর মুখ-মণ্ডল দর্শন করিয়া এবং সেই শ্রীমুখে মুখরিত মুরলীর সুতান শ্রবণ করিয়া বিভল হইয়াছি। স্বরূপ ঠাকুরের গানতো—গান নয়—উহা যেন ব্রজ-রস-মূর্ত্তি-প্রদর্শনের মহামন্ত্র! কি বলিব প্রভু,—আশ্চর্য্য—অতি আশ্চর্য্য। পিতৃদেব তখন বিভল অবস্থায় স্বরূপ ঠাকুরের চরণ-তলে পড়িয়া উহার চরণ-যুগল বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—রমণীগণ আকুল কণ্ঠে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন—সে দিন কিয়ৎক্ষণ আমরা কি যে ভাবে ছিলাম, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।”

মহাপ্রভু বলিলেন,—একে স্বরূপের গান, তাহার উপরে আবার শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বর্ণনাত্মক পদ-গীতি!

> কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
> কৃষ্ণ আদি নর-নারী করায় চঞ্চল॥
> অপূর্ব্ব-মাধুরী কৃষ্ণের অধূর্ব্ব তার বল।
> তাহার শ্রবণে মন হয় টল মল॥

সে গানের স্থান—আবার রায় ভবানন্দের ভক্তি-ভবন! এমন প্রেমের গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলনে মধুময় ব্রজরস যে অবাধে উছলিয়া উঠিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?”

স্বরূপ। প্রভু, স্থান-মাহাত্ম্যে কি না হয়? কূপের জলও বিষ্ণু-চরণ-স্পর্শে চরণামৃত হইয়া উঠে। ইহাতে অধমের কৃতিত্ব কি?”

এ দিকে গৌড়ীয় ভক্তগণ কৃষ্ণ-কথায় ও রস-কীর্ত্তন-শ্রবণে এমনই

বিভোর হইয়াছিলেন যে কি রূপে এই সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে ছিল, তাঁহারা তাহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই। শিবানন্দ সেন মহাশয় মহাপ্রভুর অবস্থা ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন— গম্ভীরা-মন্দিরের নিকট এত লোকের ভিড় রাখা ভাল নয়, মনে করিয়া তিনি ভক্ত-বৃন্দসহ প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায়-ভিক্ষা চাহিলেন।

প্রভু বলিলেন,—"তোমাদের সঙ্গে একত্র অবস্থানে আমার যে কত সুখ, তাহা তোমরা জান। কিন্তু এখন আমার যে অবস্থা এ সময়ে তোমরা সকলেই আমার প্রতি কৃপা রাখিবে।"

বলিতে বলিতে প্রভুর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিবানন্দ প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে গৌড়ীয় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

স্বরূপ ও রামরায় প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন,—"বসো, একবারে সকলে আমায় ছাড়িয়া যাইও না। বহু লোকের সঙ্গে থাকাও আমার ক্লেশ, আবার একা থাকাও ক্লেশ। কৃষ্ণের মাধুরীর কথা তুলিলেই আমার হৃদয়ে এমন তরঙ্গ উছলিয়া উঠে যে আমি কিছুতেই উহা সহসা সম্বরণ করিতে পারি না।

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারি মনে রহে ক্ষোভ॥

স্বরূপ, রূপানুরাগের পদগুলি নিত্যই নূতন বলিয়া মনে হয়— উহারা যেন পুরাতন হইতে জানে না। তুমি যে একদিন একটি

গান করিয়াছিলে—"পাসরিতে মনে করি যতনে ভূলিতে নারি"—পদটী যেন আমার প্রাণে লাগিয়া রহিয়াছে।"

রামরায় বলিলেন,—"পদটী বোধ হয় আমি শুনি নাই।"

স্বরূপ তখনই গান ধরিলেন—

নবজলধর তনু থির বিজুরী জনু
পীতবসনাবলী তায়।
চূড়া শিখিদল বেড়িয়া মালতী মাল
সৌরভে মধুকর ধায়॥
শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভূলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে॥
কিবা সেই মুখ শশী উগারে অমিয়া-রাশি
আখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায়॥
এ তিন ভুবন যত রস সুধা নিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়ে ফেলিয়ে।
দাস অনন্ত কয় হেনরূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জিয়ে॥

গান শেষ হইলে মহাপ্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"রামরায়, সন্নিপাত জ্বরের তৃষিত রোগীর ন্যায় আমার কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে, বলিয়া তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিব না।

আমি কখনও শ্রীমতীর ভাবাস্বাদনের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলাম—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥

স্বরূপের মুখে আর একদিন একটি পদ শুনিয়াছিলাম—

জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারিনু
হৃদয় না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি-পথ পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াঞিনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল ॥

এই ভাবের আভাসে আমি দিন-যামিনী জর্জ্জরিত হইতেছি। ব্রজবালাগণ শ্যামরূপ দেখিয়া কোনও দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহারা যত দেখিতেন ততই দর্শন-তৃষ্ণা বাড়িত। এইরূপে তাঁহাদের নিকট নিমেষের অদর্শনও অসহ্য হইয়া উঠিত। তাঁহাদের কথা এই :—

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ,—কৃষ্ণ কি দেখিবে মুঞি ॥

স্বরূপ মহাপ্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রভু এস্থলে

আর একটি পদ মনে হইতেছে। আপনি ও রায় মহাশয় উভয়েই এই গানটী আস্বাদন করুন।"

মহাপ্রভু অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—"গাও, স্বরূপ গাও! অমৃতে কি অরুচি আছে? কি বল, রাম রায়!"

রাম রায়। হাঁ প্রভু। মনে হয় দিন-যামিনী ঠাকুর স্বরূপের গান শুনিয়াই অতিবাহিত করি। লোকে গান শ্রবণ করে—আর আমি স্নুধু শ্রবণ করিনা—এখানে গানের মূর্ত্তিমান রসরাজ মূর্ত্তিটী প্রত্যক্ষ করি। ঠাকুর মহাশয়, তবে আর বিলম্ব কেন?

স্বরূপ। বিলম্ব কেবল—আপনার বাক্যের অবসানের প্রতীক্ষায়। এই শুনুন—

হেরি মুখচন্দ্র সুধা-রস-লহরী
কিরণ হি ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি চকোরিণী কামিনী
লোচন নিশি দিশি ভোর॥
সজনি, অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘিনি ঘটাওল
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥
দারুণ দৈব কয়ঁলু দোঁহ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরষে এ দুহুঁ দিঠি পুরল
কৈছে হেরব মুখ চাই॥

তাহে গুরু দুরজন লোচন কণ্টক
সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতী বাদ বিবাদ করত কত
ধৈরজ লাজ বিচার॥
সবহুঁ উপেখি যাই বনে পৈঠব
কানু গীমে করি হার।
নিরজন রাতি দিবস সুখে হেরব
এহি দঢ়াইনু সার॥

মহাপ্রভু বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে অতিশয় আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "স্বরূপ, স্বরূপ, কত গান তোমার মুখে কত দিন শুনিয়াছি, কিন্তু এ গানটী তো কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—এতো গান নয়—এ যে ব্রজরসের অমিয়-সুধা। স্বরূপ তুমি এ গান কোথায় পাইলে?

"হেরি মুখচন্দ্র-সুধারস-লহরী-
কিরণ হিঁ ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি চকোরিণী কামিনী
লোচন নিশি দিশি ভোর॥"

আঃ মরি মরি! কি সুন্দর মধুরোজ্জ্বল শুভ দর্শন, আর কি সুন্দর সুধাময় শব্দ বিন্যাস! যেমন ভাব, তেমন রস—তেমনই পূর্ণ প্রত্যক্ষ! শ্রীমুখচন্দ্র হইতে সুধারস-লহরী প্রবাহিত হইতেছে, সে প্রবাহের বিরাম নাই। আর সেই মুখচন্দ্রের কিরণে ভুবন সমুজ্জ্বল। কামিনী-লোচন-চকোর সে সুধাংশু-সুধার আশায়

নিশি দিন বিভোর, কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল! কি মধুর! রাম রায়, ইহা কবি-কল্পনার ভাষা নয়—ইহা প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। আর আমাদের স্বরূপ কি অপূর্ব্ব সুরে,—কি মধুর স্বর-ঝঙ্কারে সেই শ্রীমুখচন্দ্র-সুধা-লহরীর উজ্জ্বল কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিলেন! এত দিনে যেন প্রকৃত পক্ষেই কর্ণ সার্থক হইল।

"সবহুঁ উপেখি যাই বনে পৈঠব
কানু গীমে করিহার।
নিরজন রাতি দিবস সুখে হেরব
এহি দঢ়াইনু সার॥"

এ কথার তুলনা মিলে না। "সকল উপেক্ষা করিয়া কানুকে গলার হার করিয়া বনে প্রবেশ করিব। আর সেখানে নির্জ্জনে দিন-যামিনী মনের সুখে প্রাণ বধুঁয়ার মুখখানি নিরীক্ষণ করিব মনে ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি।" সে মুখ যাহারা দেখে তাহাদের কি আর অন্য বাসনা থাকে, রাম রায়? তাহারা সকল ছাড়িয়া শ্যামকে চায়। রূপানুরাগের ইহা ধারা। স্বরূপ, তুমি ধন্য—আর ধন্য তোমার দয়া! তোমার গানের মূল্যে আমি তোমার নিকট চিরদিনই বিক্রীত হইয়া রহিলাম।"

এই বলিয়া মহাপ্রভু পার্ষদগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনার্থ গাত্রোত্থান করিলেন! দর্শকগণ দেখিলেন পুণ্য পবিত্রতা-মাখা প্রেমভক্তি যেন বহু সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীআনন্দ-রসামৃত-মূর্ত্তির অনুসরণ করিতেছেন।

অভিসার।

আষাঢ় মাস। রথযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী। নীলাচলে রথযাত্রা উৎসবের বিপুল সমারোহ। আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন। বারিধারার বিরাম নাই। প্রভুর হৃদয়ও বর্ষার আকাশের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণবিরহাচ্ছন্ন। নয়নধারার বিরাম নাই। ভক্তগণ এক একবার শ্রীমন্দিরে আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া যান। একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অন্যত্র তিষ্টিতে পারেন না। প্রভুকে না দেখিলেই তাঁহাদের প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। কোন কথা হউক বা না হউক, তাঁহারা কেবল অই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়াই সুখী। কিন্তু প্রভুর এই বিরহ-যাতনার ক্লেশ ভক্তগণ একবারেই সহিতে পারেন না। কি প্রকারে তাঁহার চিত্ত অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে সকলেরই ইহাই চেষ্টা। কিন্তু সে প্রয়াস নিষ্ফল। কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কোনও কথায় তাঁহার রুচি নাই। এমন কি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের জন্যও আর তিনি পূর্ব্ববৎ বাহির হন না। এই অবস্থায় প্রভুকে লইয়া ভক্তগণের এক বিষম ভাবনা।

বর্ষায় ব্রজরসের উদ্দীপনা স্বভাবতঃই বেশী। আকাশে সততই শ্যামল মেঘমালা—মেঘের পর মেঘ—নিবিড় কৃষ্ণ-ঘনঘটা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি আনিয়া দেয়। স্নিগ্ধ শ্যামল পত্রাবলীপূর্ণ তরুলতার অন্তরালে শিখিকুলের কলধ্বনি হৃদয়ের স্তরে স্তরে ব্রজবিহারীর কথাই জাগাইয়া তুলে। বর্ষার কোন কোন সময়ে মহাপ্রভু নির্জ্জন জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে একটি কুটীরে বাস করিতেন। বনের শ্যামল

সম্পদে বর্ষায় জগন্নাথবল্লভ উদ্যানটি প্রভুর হৃদয়ে ব্রজের মাধুর্য্য সঞ্চার করিত। তাই তিনি গম্ভীরা ছাড়িয়া বর্ষার সময়ে এই উদ্যানে বাস করিতেন। বর্ষার অবিরল বাদলে উদ্যানের বৃক্ষবল্লরীর ও লতাবিতানের শ্যামল পত্রগুলি কলধৌত হইয়া সরলতামাখা স্নিগ্ধ মাধুরীতে পরিশোভিত হইত। প্রভুর কুটীর সম্মুখস্থ নিবিড় পত্রাবৃত তমাল-তরুটীর শ্যামল কোমলচ্ছবি সহসাই তাঁহার চিত্তে ব্রজমাধুরীর সঞ্চার করিয়া দিত। উপরে মেঘ-মেদুর স্নিগ্ধ আকাশ, সম্মুখে নিবিড় শ্যামল কুসুমকাননের অনন্তমাধুরী—আর কুটীরে কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্তসহ কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল—শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর!

যে দিনের কথা বলিতেছি, তাহার পূর্ব্ব দুইদিন হইতে অবিরল বৃষ্টি হইতেছিল—ক্ষণতরেও রবির মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। বিপুল উদ্যানের বিশাল স্নিগ্ধশ্যামল শোভার মাঝখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়তম বনকুটীর;—আনন্দ-ময়ের চিরহরিৎক্ষেত্রের এমন প্রাবৃট-শোভার রঙ্গভূমি প্রত্যক্ষ না করিলে কেবল বর্ণনাদ্বারা উহার অনুভব হয় না। প্রতিনিয়ত পরিস্নাত লতাবল্লরীর কোমলোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি সহসাই চিত্তের সমক্ষে বৃন্দা-বনের ভাব উদ্দীপনা করিয়া দেয়।

বসন্তের প্রথম বিকাশে এই লতাকুঞ্জপূর্ণ উদ্যানের বৃক্ষবল্লরীতে যে সকল কলকণ্ঠ বিহগের কাকলি শুনিতে পাওয়া যায়, এখন এখানে তাহার একটিও নাই—সে কোকিল নাই, দয়েল নাই, শ্যামা নাই, পাপিয়া নাই, সে ফুল নাই, সে ফলও নাই—আছে কেবল মেঘগর্জ্জনে মত্ত নৃত্যশীল শিখিকুল, আর বিরহবেদনা-উদ্দীপক উহা-

দের কেকারব। তবুও কিন্তু এই উদ্যান আনন্দে ভরপুর—ভাদ্রের ভরাগাঙ্গের ন্যায় ভরপুর—আনন্দে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত—আকাশের সোহাগ-ধারায় চারিদিকেই শ্যামল স্নেহের সুধাতরঙ্গ !

বিশাল কাননভূমি। চারিদিকে নিবিড় বনের শ্যামল উৎসব—বৃক্ষলতাবল্লরী পললধারায় সদ্যঃস্নাত—কলধৌত—চিরপ্রফুল্ল ও চির-সুন্দর ! দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি চলে, অনন্ত তীর্থযাত্রীর ন্যায় সদ্যঃস্নাত বৃক্ষবল্লরীর সারি ! মহান্ অনন্ত ও অফুরন্ত—এই জগন্নাথবল্লভ-উদ্যান-মহিমা ! আর ইহারই মধ্যে—একখানি লতা-কুঞ্জ-কুটীরে মহাভাবস্বরূপিণীর মহাভাবে বিভোর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু। স্বরূপ ও মুকুন্দ দত্ত রুণু-রুণু স্বরে গাইতেছেন—

ঝর ঝর বরিষা সঘন জলধারা।
দশদিশ সবহুঁ ভেল আঁধিয়ারা॥
এ সখি কি করব পরকার।
অব জনু বারএ হরি অভিসার॥
অন্তরে শ্যামরচন্দ্র পরকাশ।
মনহি মনোভব লই নিজপাশ॥
কৈছনে সঙ্কেত বঞ্চব কান।
সোঁয়রি জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝম্ঝম্ শব্দ কুলিশ ঝনঝান্॥
ঘরমাহ রহত রহই না পার।
কী করব রে সখি বিঘিন বিথার॥

চঢ়ব মনোরথ সারথি কাম।
তোরিত মিলায়ব নাগর ধাম॥
মন মঝু সাথী দেত পুনবার।
কহ কবিশেখর কর অভিসার॥

গানটী শুনিয়া মহাপ্রভু অধিকতর আনমনা হইয়া বলিলেন, "তোমরা আমায় কোথায় আনিয়াছ,—ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমি কোথায়? মনে হয়, বনে আসিয়াছি।"

এই বলিয়া একবারেই নীরব হইলেন, অবশের ন্যায় অনিমিক্‌নয়নে সম্মুখের তমাল-তরুর দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বরূপ, মুকুন্দ, রায় রামানন্দ ও রামবসু এ অবস্থায় কি করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রামানন্দরায় প্রভুর পশ্চাৎদিকে যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন এবং ধীরে ধীরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন।

প্রভু রামরায়ের গলা ধরিয়া বিরহবিহ্বল অবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"সখি, এই দারুণ বরষায় আর আমার ঘরে থাকা হলো না—জলধারারও তো বিরাম নাই—আকাশ ঘোর আঁধার। এখন বল দেখি কি করি? বন্ধু হয়ত আমার উদ্দেশে সঙ্কেত-স্থলে এসেছে—আমি এখন এখানে কি করিয়া অপেক্ষা করি? শ্যামদর্শনে কি সখি এতই বিঘ্ন? বিঘ্নই বা কি? এই তো সুসময়।"

এই বলিয়া রামরায়ের স্কন্ধে ভর করিয়া মহাপ্রভু বিহ্বল অবস্থায় দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করিলেন, সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আগ্রহের সহিত বলিলেন—"বন্ধু, আর তিলেক দাঁড়াও, এই যে

আমি এসেছি।" এই বলিয়া রামরায়ের গলা ধরিয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রভুর এই বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থা দেখিয়া রামবসু অত্যন্ত ভীত ও মর্ম্মাহত হইয়া স্বরূপকে বলিলেন, "ঠাকুর, প্রভুর এই বিহ্বল অবস্থা দেখা আমার একবারেই অসহ্য। উনি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন তখন উঁহাকে অতি আপন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই অবস্থায় বোধ হয় আমাদের সহিত যেন উঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, আমরা উঁহার প্রীতির এক কণারও যেন অধিকারী নই, সত্যই বলিতেছি, ইহাতে আমার বড় ক্লেশ হয়।"

স্বরূপ। বসু মহাশয়, কৃষ্ণ-প্রেমের ইহাই রীতি—কৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনে এই তন্ময়ত্ব অতি স্বাভাবিক।

রামবসু। তা বটে। উনি স্বীয় আনন্দসুখে বিভোর, কিন্তু নয়ন ও মুখমণ্ডলের ভাবে আমার কষ্ট হইতেছে—কি-যেন-কি-এক জগৎ-ছাড়া ভাব।

স্বরূপ। তাতো হবেই, উনি তো এখন শ্রীরাধাভাবে বিভোর—একবারেই কৃষ্ণময় জগত! চাহনি দেখুন, কেমন সাগ্রহ সতৃষ্ণ দৃষ্টি! অদূরে যেন কৃষ্ণ দর্শন করিয়া নয়ন দুটি যেন সেই অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে!

রামবসু। ঠিক যেন শ্রীমতী রাধিকা।

স্বরূপ। ঠিক্ কথা! শ্রীরাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-আস্বাদন এবং প্রেমিক ভক্তগণের নিকটে সেই ভাব-প্রদর্শন—ইহাই এই লীলার এক বিশেষত্ব।

রামবসু। এই যে প্রভুর নয়ন নিমীলিত হইল—নয়ন-কোণে অশ্রুধারা, কপালে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে।

স্বরূপ। বোধ হয়, সত্বরেই চেতনা হইবে। মুকুন্দ, তুমি উঁহার মস্তকে ধীরে ধীরে বাতাস দেও, আর মৃদুস্বরে কৃষ্ণনাম কর, আমি উঁহার পদমূলে বসি।

গোবিন্দ। সে সেবা আমার। যাহাতে সত্বরে প্রভুর চেতনা হয়, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।

স্বরূপ। গোবিন্দ, উনি বারবার আমায় বলেন, "স্বরূপ, আমি যখন লীলা-দর্শন-সুখে মগ্ন থাকি, সেইটুকুই আমার আনন্দ, তারপর কেবলই বিরহ-যাতনা।

গোবিন্দ। আমি ও সকল কথা বুঝি না—উঁহার উত্তান নয়ন, —অচেতন ভাব ও মলিন শ্রীমুখমণ্ডল—আমি একবারেই সহ্য করিতে পারি না।

রামবসু। আমারও ঐ কথা।

স্বরূপ। আমিই কি সহিতে পারি, তবে কথা এই যে, উঁহার নিজের আনন্দই বড় বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়।

যখন এই সকল কথা হইতেছিল, রামরায় নির্নিমেষলোচনে কেবলই প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, আর বস্ত্রাঞ্চলে প্রভুর অশ্রুধারা মুছাইতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—এবার প্রাকৃত দৃষ্টি। মৃদুস্বরে বলিলেন—"তুমি, কে? ওঃ বুঝেছি স্বরূপ।" এই বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। নয়ন হইতে তখনও জলধারা পড়িতেছিল। প্রভু যেন কি

দুই একটী কথা বলিতে যাইতেছিলেন—বাক্য অতি মৃদু, অস্ফুট-আর্ত্তিভাবপূর্ণ। বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিলেন না,—ভাব-সংবরণ করিয়া বলিলেন "এখনও খুব বৃষ্টি হইতেছে। আজ উদ্যানের শোভা কি মনোহর—যেন ব্রজমাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে!"

স্বরূপ। বলি, দেখা হলো তো?

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—সুখের স্বপন কতক্ষণ থাকে, স্বরূপ? সে কথায় আর কাজ কি? আমার সারা জীবনটা যেন একটা স্বপ্ন। সে কথা এখন থাক্। আমার স্মরণ হইতেছে যেন একটী অভিসারের গানের ঝঙ্কার আমার কাণে গিয়াছিল।

রাম রায়। সেটি বড় মিথ্যা নয়, প্রভু। উনি ও মুকুন্দ উভয়ে মিলিয়া বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটী অভিসারের পদ গাইয়াছিলেন,—সে বড় মধুর, বড় সুন্দর! প্রভু তখন ভাবাবিষ্ট, তাই উহাতে আমার মন ছিল না; সে সঙ্গীত-সুধা ভালরূপে আস্বাদন করিতে পারি নাই।

প্রভু। বটে—কিন্তু দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় এখনও আমার কাণে যেন তাহার ঝঙ্কার লাগিয়া রহিয়াছে:—

"অন্তরে শ্যামর চন্দ্র পরকাশ"

এইরূপ নয় কি?

স্বরূপ। হাঁ প্রভু।

প্রভু। তবে সকল কথা শুনি নাই, শুনিলেও মনে নাই। কেবল ঐ টুকু খুবই মনে আছে। ওটি কি অভিসারের পদ?

স্বরূপ। হাঁ প্রভু।

প্রভু। "অভিসার"—কি বল স্বরূপ!—অতি সুন্দর! প্রাণ যাকে চায়, তাকে দেখিবার জন্য আকুল প্রাণের দৌড়! স্বরূপ, ইহাই তো অভিসার?

স্বরূপ। হাঁ প্রভু, তাই বটে। কিন্তু সে দৌড় বড় সোজ নয়। তা হ'লে আমিও দৌড়িতে চেষ্টা করিতাম—উহা আপনারই হয়। আমাদের তো ঘটে না।

প্রভু। আমারই বা কি ঘটিল—যেখানে ছিলাম সেই খানেই আছি—এক পদও তো নড়িতে পারি নাই। তাকে ত পেলাম না!

রামরায়। শ্রীঅঙ্গের কথা কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু নয়নের দৌড় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

প্রভু। আসল কথা বলিতে কি, আমি অন্য ভাবে যেন স্বপ্নে শ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি যেন আমায় সঙ্কেত করিয়াছিলেন?

স্বরূপ। প্রভু, সেই "অন্য ভাব"টী কি? আমরা তো "অন্য" কিছু বুঝিতে পারি না।

প্রভু। থাক্, স্বরূপ। এখন অভিসারের কথাই বল। তুমি বিদ্যাপতি ঠাকুরের অভিসারের কোন্ পদটী গাইয়াছিলে?

স্বরূপ। এই আজের মত দিন—অবিরল বারিধারা, মেঘে চারিদিক আন্ধার, দুরু দুরু মেঘ-গর্জ্জন—আর ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির শব্দ। এভাবে শ্রীমতীর ঘরে থাকা দায়—বাহির হওয়াও দায়।

ঘরমাহ রহত রহই না পার।
কি করব ই সব বিঘিনি বিথার॥

প্রভু। তার পর ?

স্বরূপ। মনোরথের তো অগম্য স্থান নাই, বাধা দেওয়ারও কেহ নাই। শ্রীমতী মনোরথে চড়িয়া শ্যাম দর্শনে বাহির হইলেন !

প্রভু। এই ভীষণ বাদলায় ও ভীষণ অন্ধকারে ?

স্বরূপ। প্রভু, অভিসারের মন বিঘ্ন ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারে না।

রাম বসু। ভালবাসার এমনই টান। মেঘ বৃষ্টির বাধা মানে না।

রাম রায়। সুধু কি মেঘ-বৃষ্টি ? কুটিল প্রতিবেশীর বিষদৃষ্টি—গুরুজনের গঞ্জনা অথচ শ্যামদর্শনের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা। লোকে তাই কথায় বলে "শ্যাম রাখি, - কি কুল রাখি !

স্বরূপ। শ্যামের প্রেমে কে কবে কুল-মান রাখিতে পারিয়াছে ? কুল-মান-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য ভাসাইয়া ব্রজবালারা তাঁহাকে খুজিতে বাহির হন। চণ্ডীদাস ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছেন।

"বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
যাব দেশে দেশে বন্ধুর উদ্দেশে
সুধাইব জনে জনে ॥"

স্বরূপের কথা শুনিয়া বসু রামানন্দের নয়নযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে লাগিলেন—"তাইতো—তাইতো ! এরূপ ব্যাকুলতা না হইলে কি কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় ? যে ব্যাকুলতায় "অভিসারে" বাহির করে, সেই ব্যাকুলতাই

প্রকৃত সাধন। হরি হরি—শ্যাম-অভিসার কি সুন্দর, কি মনোহর, চিত্তের কি প্রবল বলের পরিচায়ক !

স্বরূপ। অভিসার, অনুরাগের অনিবার্য্য পরিণাম—যেখানে অনুরাগ বলবান্ – সেখানে অভিসার অপরিহার্য্য।

মহাপ্রভু। স্বরূপ অতি ঠিক্ কথাই বলেছ,—অনুরাগ যত প্রবল অভিসার ততই অনিবার্য্য। ব্রজরসের অভিসার অপূর্ব্ব রসময়। তোমাদের ন্যায় প্রেমিক ব্যতীত এ তত্ত্ব আর কাহার নিকটেই বা শুনিতে পাইব ? এই বাদলার দিনে, আর এই মনোহর শ্রীজগন্নাথ বল্লভ-উদ্যানে আজ তোমরা ব্রজ-অভিসারের কথা বলিয়া আমায় কৃতার্থ কর।

মহাপ্রভু অতি আর্ত্তভাবে এই কথাগুলি বলিয়া স্বরূপের মুখের দিকে সরল প্রাণ শিশুর ন্যায় সতৃষ্ণ ভাবে চাহিয়া রহিলেন। স্বরূপ বিনীতভাবে বলিলেন "অভিসারের যোগ্য প্রাণ না পাইলে অভিসারের গান গাওয়া চলে না। আপনার কৃপায় আপনার তুষ্টির জন্য অভিসারের গান শিখিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু দয়া করিয়া এমন প্রাণ দিন, যেন আপনার সেবায় মন দিতে পারি, আর প্রাণের পূর্ণতায় হৃদয়ের প্রবল অনুরাগে আপনার কৃপাদেশ প্রতিপালন করিতে পারি।

রামরায়। আজ যেমন আকাশ হইতে বরষার ধারায় প্রতপ্ত পৃথিবী রসসিক্ত হইতেছে, আমার শুষ্ক হৃদয়টীকেও বুঝি বা শ্রীপাদ স্বরূপ ঠাকুর আজ সেইরূপ রসের ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিবেন ?

স্বরূপ। সুরসিক রায় মহাশয় রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তিনি ব্যঙ্গ-

বাক্যেই বা কৃপণ হইবেন কেন? যাহা হউক, এখন প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করি।

এই বলিয়া স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন—"প্রেমময়, ব্রজগোপীর অভিসার রসের পরাকাষ্ঠা। বর্ষার প্রবল বেগে তরতর গঙ্গাস্রোত দুকূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হয়, সুনীল সাগর-সঙ্গমের জন্য জহ্নু তনয়ার সে বিপুল অভিসার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু শ্যাম-সাগরের অভিমুখে রূপানুরাগের প্রবল বেগে রসময়ী ব্রজবধূগণের অভিসারের তুলনায় উহা কিছুই নহে—কি ভীষণ বেগময়—কি বিপুল কি অদম্য শক্তিময়—এই অভিসার! কোন বাধাই এই অভিসারের গতিরোধ করিতে পারে না। যাহারা কুসুম হইতেও সুকোমল, তাহাদের অভিসারে এত বেগ—ইহা ধারণারও অতীত। যাঁহাদের আচরণ সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রমাণ—তাঁহারা শ্যামের অনুরাগে সকল ধর্ম্মে তিলাঞ্জলি দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ঘরের বাহির হইয়া শত বিঘ্ন-বিপত্তির বাধা অবহেলা করিয়া কণ্টক-কঙ্করপূর্ণ বনে শ্যামসুন্দরের অন্বেষণ করেন—এ অভিসার অতি চমৎকার!

প্রভু, লোকে প্রেমরস কোমল বলিয়া মনে করে, কিন্তু এই কোমলতা যে এক শক্তির আধার—তাহা মনে করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এই শক্তির মূলে কেবলই সেই রূপানুরাগের প্রবল বেগ—

"সখি, শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে।"

দিবানিশি গোপী-হৃদয়ে শ্যামরূপের এই অফুরন্ত জাগরণই

অভিসারের নিদান। শ্রীকৃষ্ণের ভীষণ আকর্ষণে মান-কুল-সুখ-শান্তি লইয়া ঘরে থাকিতে পারে, এমন সাধ্য কাহার? বর্ষার প্রতিনিয়ত পললধারায় যখন নদীর বক্ষ পূর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠে, তখন দুকূল ভাসাইয়া উধাও হইয়া ধাবিত হওয়া ভিন্ন তটিনীর পক্ষে আর অন্য গতি কি আছে? শ্যামের অনুরাগে অনুরাগে চিত্ত যখন ভরপুর হইয়া উঠে, ব্রজবধূদের পক্ষেও তখন অভিসার ভিন্ন আত্ম-যাতনা-ভার-বিমোচনের আর অন্য উপায় নাই।

মহাপ্রভু। স্বরূপ, রাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপী-মণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেন তখন তাঁহারা আকুলভাবে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করেন—এই যে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে গোপী-দের বনভ্রমণ,—ইহাও কি অভিসার?

স্বরূপ। না প্রভু। অভিসারের অর্থ—অভিমুখে গমন; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে আছেন সেই স্থানাভিমুখে গমন। অভিসার করার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি-স্থল জানা চাই।

মহাপ্রভু ব্রজবধূরা কুলবালা, শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন ও যথেচ্ছ-বিহারী, তিনি কখন কোথায় থাকেন, ব্রজবালারা তাহা জানিবেন কিরূপে? আর বিশেষতঃ রজনীতে বনেই বা তাঁহাকে পাওয়ার জন্য ব্রজবধূরা কোন আশায় অভিসার করেন?

স্বরূপ। প্রভু, ব্রজলীলা-রহস্যের মূলে প্রবল অনুরাগ বর্ত্তমান, কিন্তু সে অনুরাগের কার্য্যসাধনায় মন্ত্রণা আছে, চক্রান্ত আছে। এ সকল কথার আভাস রায় মহাশয় পূর্ব্বেই তো প্রভুর আজ্ঞায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহ অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

প্রভু। কেবল শ্রীমতীর অনুরাগেই মিলন হয় না—আর এক জনের অনুরাগে যে মিলন - সে মিলন রসের মিলন নয়। একের অনুরাগে দর্শন সম্ভবপর হয়, কিন্তু মিলন সর্ব্বথা সম্ভবপর হয় না। দুইএর অনুরাগের ফলে উভয়ের যে দর্শন,—সেইটীই মিলন। কেবল দর্শনের জন্য যে গমন,—সে গমন অভিসার নয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য যে গমন, সেইটী অভিসার। মিলনের পূর্ব্বে উভয়ের অনুরাগ প্রবল ও স্পষ্ট হয়। এই অবস্থায় সখীর সাহায্যে মিলনের বন্দোবস্ত হয়। সখী তখন উভয় পক্ষের দূতীর কার্য্য করেন। মিলনের জন্য একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই স্থানের নাম সঙ্কেত-স্থান।

মহাপ্রভু। স্বরূপ, তোমায় একটুকু বাধা দিতেছি। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা পাকা বন্দোবস্তের কথা। এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইলে বিশেষ মন্ত্রণার অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু অনুরাগের মিলনে এত অন্যাপেক্ষতা থাকিলে সে মিলন তো বড় কঠিন ব্যাপার!

স্বরূপ। হাঁ প্রভু, কঠিন ব'লে কঠিন? তাতে কত বাধা?

কিন্তু এই সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রমের পর যে মিলনটী ঘটে তাহা আবার এত মধুর,—যে সেরূপ মাধুর্য্যও অন্যভাবে সম্ভবপর হয় না। যাহা সহজে লাভ হয়, সাধারণতঃ তাহার মূল্যও বড় কম, আর যাহা অতি ক্লেশে পাওয়া যায়, তাহা অতি মধুর। এই হিসাবে এইরূপে মিলনের ফল স্বভাবতঃই অতি মূল্যবান্।

মহাপ্রভু। ঠিক্ কথা, স্বরূপ! তারপর?

স্বরূপ। তারপর প্রভু,—সঙ্কেত-স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয়। অতঃপর দূতী শ্রীকৃষ্ণকে সেই সময়ে ও সেই স্থানে আগমন করিতে আমন্ত্রণ করেন এবং শ্রীরাধাকেও এই বন্দোবস্ত জানাইয়া যথাসময়ে সঙ্কেত-স্থলে গমনের বার্ত্তা প্রদান করেন।

মহাপ্রভু। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহাতে বাধা বড় বেশী নাই, কিন্তু শ্রীরাধার পক্ষে তো অনন্ত বাধা!

স্বরূপ। বাধা বলিয়া বাধা! ঘরের বাধা, পরের বাধা, মনের বাধা, বনের বাধা, কতই বাধা। কিন্তু অনুরাগের আবার এমনই মহিমা, যে সকল বাধা পায়ে দলিয়া শ্রীমতী তাঁহার হৃদয়-বল্লভের সহিত মিলিবার জন্য ভয়ে ভয়ে ব্যাকুলভাবে অভিসার করেন।

মহাপ্রভু। স্বরূপ, শ্রীরাধার অভিসারের ভাবটী বাস্তবিকই চমৎকার—একদিকে ব্যাকুলতা, অপরদিকে আশঙ্কা—এই উভয় ভাবের সঙ্কটের মধ্য দিয়া শ্যামসুন্দরের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া অতীব সাহসের কার্য্য।

স্বরূপ। তাইতো প্রভু, এই জন্যই তো দুঃসাহসও অভিসারের

একটা অঙ্গ! সঙ্কট তো বটেই। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণাভিসারের জন্য ব্যাকুলা, এদিকে ঘরে গুরুজন ও পুরে পরিজন জাগিয়া রহিয়াছে। কাহারও নয়নে নিদ্রা নাই, কি করিয়া শ্যাম-দর্শনে যাইবেন :—এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীরাধা ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে শ্যাম-দর্শনে বাহির হইলেন। শ্রীমতী যে ভাবে বাহির হইলেন, ঠাকুর বিদ্যাপতির পদে তাহা প্রকাশ। যথা :—

নব অনুরাগিনী রাধা!
কিছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়ান।
পন্থ বিপথ নহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচকুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কন মুদরী।
পথহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জরী পায়।
দূরহি ত্যজি চলি যায়॥
যামিনী ঘোর আন্ধিয়ার
মনমথ হিয়া উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারল বাট।
প্রেমক আয়ুধ কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছন না হেরি আন॥

গানটী শেষ হওয়া মাত্রই মহাপ্রভু বলিলেন "অতি সুন্দর। স্বরূপ, শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে যখন গমন করিলেন, তখন তাঁহার নিজের দেহও নিজের নিকট ভার বোধ হইয়াছিল, নিজের সৌন্দর্য্যসাধক অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কেত স্থানে গমন করিলেন। অভিসারে দেখিতেছি, আত্মদৃষ্টি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, আত্মদেহের বিস্মৃতি ঘটে। শ্রীরাধা প্রেমের কি অনবদ্যচনায় প্রভাব!

স্বরূপ। তাই তো প্রভু। শ্রীরাধা-প্রেমের তুলনা নাই। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্যই ব্যাকুলা,—নিজের রূপ দেখাইতে যাওয়া তাঁহার অভিপ্রায় নয়, ভূষণ অলঙ্কারে তাঁহার কি প্রয়োজন?

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য,—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম ; প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগিমাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥

মহাপ্রভু। স্বরূপ, কাম ও প্রেমের এই পার্থক্য-লক্ষণ বাস্তবিকই অতি সুন্দর। কিন্তু ইহাতে একটী সন্দেহ এই যে, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণদর্শন জন্য যখন ব্যাকুল হইয়া অভিসার করেন, তখন কি তাহার মনের কেবলই এই ভাব,—যে কৃষ্ণকে সেবা করিয়া আমি তাহাকে সুখী করিব তদ্ভিন্ন আমার নিজের কোন সুখ নাই।" এই বাসনা হৃদয়ে লইয়াই কি শ্রীমতী অভিসার করেন ? শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে যে আত্ম-নয়নানন্দ হয়, সে কি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি নয় ? যদি কৃষ্ণকে সুখদানের জন্যই শ্রীমতীর এ প্রয়াস হইত, তবে উহা কি কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত না ? কি বল স্বরূপ ?

স্বরূপ। এ সমস্যা বড় কঠিন। আমার তো মনে হয় শ্রীরাধার আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-ইচ্ছার লেশাভাসও নাই। কর্ত্তব্যতা-পালনের ভাবও তাঁহাতে নাই। শ্রীমতী সহস্র দুঃখকে তুচ্ছ করিয়াও কৃষ্ণদর্শনে গমন করেন, তিনি আত্ম-সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতে প্রয়াস পান না—সে মিলন-প্রয়াসে তাঁহার সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক।

মহাপ্রভু। তবে কি কৃষ্ণসেবা কর্ত্তব্য মনে করিয়াই তিনি তদ্দর্শনে গমন করেন ?

৯

স্বরূপ। তাহা হইলে আর প্রাণের টান কোথায়?—মাধুর্য্যই বা কোথায়?

মহাপ্রভু। যদি ইহাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির কথা না থাকে, নিষ্কাম কর্ত্তব্যতার কথাও না থাকে; তবে এত ক্লেশময় প্রয়াসের উদ্দেশ্য কি?

স্বরূপ। আমার তো মনে হয়, প্রভু, শ্রীমতী প্রাণের টানে অধীর হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ না দেখিয়াই থাকিতে পারেন না—ইহাই তাঁহার স্বভাব। সুখের বাঞ্ছা ইহাতে নাই, অপরপক্ষে সে সুখ-লাভ করিতে গিয়া প্রতিদানে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সে দুঃখের অনন্তদহন স্বীকার করিয়াও শ্রীমতী শ্যামদর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েন—সুখের পরিবর্ত্তে শত বৃশ্চিক-দংশন-দাহ তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয় শ্যামদর্শন না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। ইহাই শ্রীরাধার প্রেমের স্বভাব।

মহাপ্রভু। এ সিদ্ধান্ত মন্দ নয়, কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, অকৈতব প্রেমের স্বভাব ও প্রভাব একবারেই অচিন্ত্য। উহা লক্ষণ দ্বারা স্থির হয় না, যুক্তি দ্বারা উহার সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। উহা কেবলই অনুভবের বিষয়। প্রমাণ পরীক্ষা ও লক্ষণের বিচারে এ তত্ত্ব বুঝা যায় না—উহা অনুভবেই উপভোগ্য। দহ্যমান গৃহে শায়িত শিশুকে তুলিয়া আনিবার জন্য স্নেহময়ী মাতা যখন জ্বলন্ত অনলের বিপদ্ জানিয়াও সেই গৃহ অভিমুখে ধাবিত হন, তখন কর্ত্তব্যতা বুদ্ধির বা সন্তান-রক্ষার ভাবী আশাজনিত আনন্দ-

লাভের উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তিনি প্রাণের টানেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; না করিয়াই স্থির থাকিতে পারেন না, তাই তাঁহার এই দুঃসাহস—এই কঠোর প্রয়াস!—এই তো কথা কি বল স্বরূপ?

স্বরূপ। হাঁ প্রভু। তাই বলিয়াছিলাম ত্রিজগতে শ্রীরাধার এই স্বাভাবিক অনুরাগের আর তুলনা নাই।

মহাপ্রভু। যথার্থ—অতি যথার্থ! অখিলরসামৃতশৃঙ্গার-রস-রাজ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে শ্রীরাধার প্রেমই উহার সাধনা। জীবের হৃদয়-প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য যখন গোপীভাবে ব্যাকুল হয়, এবং সেই ব্যাকুলতার আতিশয্যে প্রেমময় যখন ভক্তের মনের দুয়ারে আত্ম-আগমনের সংবাদ পাঠান, সাধক হৃদয়ে সেই আশায় উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত সংমিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়, সংসার তখন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সংসারের কোলাহল ও বাধা-প্রতিবন্ধের মধ্যে দিয়া জীব তখন আপন প্রাণবল্লভের চরণ-নিকটে ধাবিত হইতে প্রয়াস পায়—ইহাই ভক্ত সাধকের অভিসার! ইহার আদর্শ শ্রীমতী রাধিকা। সাধকের মানস-নয়নের সমক্ষে সমুজ্জ্বল আদর্শ থাকা চাই। আলোকবর্ত্তি না থাকিলে যেমন অন্ধকারের মধ্য দিয়া গম্যস্থানে অগ্রসর হওয়া যায় না, শ্রীকৃষ্ণাভিসারী সাধকের সমক্ষেও সমুজ্জ্বল আদর্শ প্রয়োজনীয়।

রামরায়। তা এবার জীবগণের ভাগ্যে অতি সমুজ্জ্বল আদর্শই স্বয়ং আগত।

রামরায়ের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই স্বরূপ গান ধরিলেন,—

"গউর না হত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
শ্রীরাধার মহিমা প্রেম-রস সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী"—

মহাপ্রভু বিরক্তির সহিত স্বরূপের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, স্বরূপের গান স্বরূপের মুখে রহিল, শেষ হইতে পারিল না। স্বরূপ মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "যাহা গাহিয়াছি তাহাই যথেষ্ট।"

রামানন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন—প্রভু, ভৃত্যের একটী কথা জিজ্ঞাস্য। আমার নিবেদন এই যে, স্বরূপের এই গানটীতে এমন কি ছিল, যাহা প্রকাশযোগ্য নয়? অই সুনীল সমুদ্র দিন-রজনী তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইতেছে অথচ কেহ কি তাহা বলিতে পারিবে না?—সুনীল গগনে চাঁদের কিরণ উজলিয়া উঠিবে, লোকে যদি বলে গগনে চাঁদ উঠিয়াছে, চাঁদ কি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন? এ গোপনের চেষ্টায় ফল কি? স্বতঃপ্রকাশ বস্তুর আত্মগোপন চলে না। এবার জীবের পরম সৌভাগ্য যে শ্রীরাধা-প্রেমের সমুজ্জ্বল আদর্শ তাহাদের নয়ন-সমক্ষে উপনীত হইয়াছেন।

মহাপ্রভু। আমি তোমাদের এই সকল তর্ক-যুক্তি শুনিবার জন্য তোমাদের শরণ গ্রহণ করি নাই। আমি অধম সন্ন্যাসী, মনের জ্বালায় জ্বলিয়া মরি, কোথাও শান্তি পাই না—

তাই তোমাদের কৃপা-ভিখারী। তোমরা ব্রজরস দিয়া আমার তৃষিত হৃদয়ের দারুণ পিপাসার শান্তি কর, আমি কৃতার্থ হই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন বিপরীত ঘটাইয়া তোলা কি তোমাদের কর্ত্তব্য ?"

স্বরূপ মহাপ্রভুকে কথা বলার আর অবসর না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—"দয়াময় ভিখারিঠাকুর, আপনার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিতে পারে এ জগতে তো এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না। সিন্ধুর স্রোতের ন্যায় কৃষ্ণ-কথার অফুরন্ত স্রোত দিন-যামিনী কর্ণপথে বহিয়া চলিলেও তো ও পিপাসার শান্তি নাই। তবে শুনুন, অভিসারের আর একটী পদ গাইতেছি ঃ—

গগনে ঘোর ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসারি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিষে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥

সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
মেরি গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
ত্বরিতে চল অব কিয়ে আগুসার
জীবন মঝু আগুসার!
শ্রীকবিশেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

স্বরূপ গানটীতে আখর দিয়া এমন সরসভাবে গাহিলেন যে, স্বয়ং মহাপ্রভুও অনিমেষ লোচনে স্বরূপের মুখের দিকে তাকাইয়া মনে করিলেন, যেন মূর্ত্তিমান্ ব্রজরস স্বরূপের মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভু অধীরভাবে স্বরূপকে আলিঙ্গন করিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন—স্বরূপ তোমরা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আজ যেমন দিন, তেমনই এই দিনের উপযোগি তোমার এই গান! বরষাকাল আসিলেই আমার ব্রজের অভিসারের কথা মনে পড়ে—আকাশ যখন মেঘে মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়, যখন আকাশ ভাঙ্গিয়া বরষার ধারা পড়িতে থাকে, আর সেই নব মেঘের কোলে দামিনী ঝক্ ঝক্ স্ফুরিত হয়—আমার হৃদয়ে সহসাই তখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-সন্দর্শনের ইচ্ছা বলবতী হয়। স্বরূপ, তাঁহার লীলা অনন্ত, কিন্তু বরষার অভিসারের কথাতেই এই সময়ে আমার প্রাণ একবারেই মাতিয়া পড়ে। শ্রীমতীর ভাব

ভাষায় প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সেই ভাষা ধন্য, যাহাতে সেই ভাবের লেশাভাসও প্রকাশ পায়। শ্রীমতী বলিতেছেন :—

"তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈছনে
পন্থ নেহারিছে মোর॥"

সখি, আজ এই তরল জলধর ঝর ঝর বর্ষণ করিতেছে, গগনে ঘোর ঘনঘটা, ঘন-ঘন গর্জ্জন করিতেছে, আর এই সময় আমার পরাণ-বঁধূ শ্যামনাগর একাকী কেমন করিয়া আমার পথপানে চেয়ে আছে ?"

ইহার পরের কথা এই—সখি আর কি আমার এখন ঘরে থাকা সাজে ? আমার মাথায় বাজ পড়ে পড়ুক, লোকে যা বলে বলুক, আমি আর ঘরে থাকিতে পারিব না !" এই বলিয়া উন্মাদিনী ঘরের বাহির হইলেন—কেমন স্বরূপ ?"

তখনও স্বরূপের নয়নকোণ হইতে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। স্বরূপ নয়নজল মুছিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ প্রভু। অনুরাগিনী—একবারেই উন্মাদিনী !" উন্মাদিনী না হইলে এই ভীষণ সময়ে কে পথে বাহির হয় ?

পন্থ পিছর নিশি কাজর কাঁতি।
পান্তরে ভৈগেল দিগ ভরঁাতি॥
চরণে বেড়ল অহি, তেহ নাহি শঙ্ক।
সুন্দরী হৃদয় নুপুর পর পঙ্ক॥

কি কহব মাধব পিরীতি তুহারি।
তুয়া অভিসারে না জীয়ে বরনারী॥
বরাহ মহিষ মৃগ পালে পলায়।
দেখি অনুরাগিণী বাঘ ডরায়॥
ফণিমণিদীপ ভরমে দেই ফুঁক।
কত বেড়ি লাগল নাগিণী মুখে মুখে॥

প্রভু, অনুরাগের উন্মাদনা না হইলে বিঘ্ন এড়াইয়া শ্যামদর্শন ঘটে না। কিন্তু অনুরাগের আবার এমনই মহিমা যে এই সকল বিঘ্নও বিঘ্ন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমতীর নিজের শ্রীমুখেই তাহা প্রকাশ :—

বঁধুর সরস দরশ-লালসে,
যাইতাম যবে নিকুঞ্জনিবাসে,
চরণে বেড়িত বিষধর কত
হইত নূপুর জ্ঞান গো।
এবে বিনা সে ত্রিভঙ্গ
শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ ভূষণে ভুজঙ্গ-জ্ঞান গো॥"

মহাপ্রভু। স্বরূপ, বলিহারি অনুরাগের সৌন্দর্য্য! কি সুন্দর—কি সুন্দর! তোমার প্রতি গানে ও প্রতি কথায় অমৃত উথলিয়া উঠিতেছে, আমি ঢোকে ঢোকে উহা পান করিতেছি। কিন্তু কিছুতেই তো তৃষ্ণা মিটিতেছে না। স্বরূপ, তারপর?

স্বরূপ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে একবারে উন্মাদিনী হইয়া বনের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হাতের কঙ্কণ, পায়ের

নূপুর পূর্ব্বেই ফেলিয়া দিয়াছিলেন, মাথার বেণী এলায়ে পড়িয়া গেল, অবশেষে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া এলোথেলো হইয়া পাগলিনীর ন্যায় চকিত নয়নে ইতিউতি চাহিতে চাহিতে গমন করিতে লাগিলেন, সঙ্গে ললিতা ছিল”—

এই বলিতে স্বরূপের কণ্ঠ সহসা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্বরূপ ম্লানমুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন।

মহাপ্রভু স্বরূপের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, স্বরূপের ঢল ঢল নলিন-নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন, “তারপর স্বরূপ,—তারপর ?”

স্বরূপ। তারপরে একটা লতায় তাঁহার পা আটকাইয়া গেল, আর শ্রীমতী অমনি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ললিতা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমতীকে ধরিয়া তুলিলেন। আবার তিনি তেমনি করিয়া উন্মাদিনীর বেশে চলিতে লাগিলেন। “দেহ ধূলি-ধুসরিত, শ্রীমুখমণ্ডল অশ্রুসিক্ত, চাহনি চকিত, চমকিত”—

স্বরূপ আবার সহসা নীরব হইলেন। মহাপ্রভু বুঝিলেন স্বরূপের বিগত স্মৃতি অতর্কিতভাবে হৃদয়ে উথলিয়া উঠিয়াছে, আর প্রত্যক্ষের ন্যায় স্বরূপ যাতনায় অধীর হইতেছেন, তাহাতেই তাঁহার বাক্য স্তম্ভিত হইতেছে। স্বরূপই যে ললিতা! কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু বলিলেন—“স্বরূপ, ও-সকল কথা থাকুক। এখন তুমি অভিসারের মিলন বল।”

রায় রামানন্দ ও বসু রামানন্দ প্রভৃতি একবারে বিস্মিত হইলেন। স্বরূপ কিয়ৎক্ষণ পরে একটুকু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—

"প্রভু, অভিসারের পর মিলন অতি মধুর। তবে সে মিলনের একটা গান করিয়াই প্রভুকে শুনাইতেছি।"

নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল
ও নবনাগর সঙ্গ।
পন্থ ঘটিত দুখ সবহু দূরে গেল
বাঢ়ল মনোভব রঙ্গ॥
দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু।
দুহুঁক দরশ-রসে ভোরল হরি সঞে
উছলল প্রেমক-সিন্ধু॥
দুহুঁক আলোকনে দুঁহু পুলকাইত
লোচনে আনন্দ লোর।
বিচরল কাঁপ ভাষা ভেল গদগদ
স্তবধ ভেল পুন ভোর॥

মহাপ্রভু। অতি মধুর—স্বরূপ, অতি মধুর। যেমন যাতনা-পূর্ণ অভিসার—তেমনই মধুরোজ্জ্বল মিলন! এ আনন্দ প্রকাশের অপর ভাষা নাই—এ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অপরকে বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। যাঁহারা তোমার মুখে এই মধুর গান শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাই এ মিলনের মহামাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন। এ ভরপুর আনন্দে সকলই নীরব, কলকণ্ঠ কোকিল নীরব, শ্যামা নীরব, দয়েল নীরব, শুকসারি নীরব, যেহেতু স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমা-হ্লাদিনী ও তাঁহার অঙ্কস্থ কুঞ্জবিহারী নীরব। নীরব নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই মিলন-বিলাস মহাভাগ্যবানেরই আস্বাদযোগ্য।"

এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন, তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল ও আরক্তিম—তাঁহার নয়নযুগলে যেন শতধারায় আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়া ছুটিয়াছে। রামরায় প্রভৃতি ভক্তগণ অনেক দিন প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডলে এমন হর্ষোৎফুল্ল ভাব দেখিতে পান নাই। রামরায় হর্ষভরে শ্রীপাদ স্বরূপকে ইঙ্গিত করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মুখখানি দেখাইয়া চুপে চুপে বলিলেন—"ঠাকুর, তুমি আজ নীলাচলে স্বয়ং শ্রীমতীকে আনিয়াছ—দেখ ঐ মুখখানি দেখ। যেন বহুদিন পরে প্রাণপ্রিয়তমকে পাইয়া শ্রীমতী আনন্দধ্যানে নিমগ্ন!"

রামবসু বলিলেন—"ঠিক কথা। আমার অনুভব অতি সামান্য। কিন্তু প্রভুর মুখকান্তিতে স্পষ্টতঃ আজ শ্রীরাধাভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীলাচল ব্রজধামে পরিণত হইয়াছে, সেই সৌন্দর্য্য, সেই মাধুর্য্য আর সেই রসের অফুরন্ত প্রবাহ!"

মহাপ্রভু তখনও বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া মিলন-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছিলেন, কিয়ৎক্ষণপরে বাহ্যজ্ঞান পাইয়া বলিলেন—"স্বরূপ, ধন্য তুমি, আজ আমায় কৃতার্থ করিয়াছ।"

স্বরূপ। প্রভু, কিয়ৎক্ষণপরে শ্রীমতী প্রেমগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে যাহা বলিয়াছিলেন আমি তাহাও গান করিয়া শুনাইতেছি :—

শুন শুন নাগর রসিক-সুজন।
তুয়া মুখ তিল আধ না দেখিলে হাম কত
কোটিকল্প করি মান॥
তুয়া নব অনুরাগে হাম আয়নু আগে
পথ হেরি আকুল পরাণ।

তোহারি দরশ অব　　　দূরে গেও দুঃখ সব
সফল ভেল পাঁচবাণ ॥
হাম অতি দুঃখিত　　　তাপিত তাহে পরবশ
তাহে গুরুগঞ্জন বোল।
গৃহের ভিতরে থাকি　　　যেমন পিঞ্জর পাখী
সদাভয়ে জীউ উতরোল ॥
অনেক পুণ্যের ফলে　　　তোমা বন্ধু পাইয়াছি
কত কত করিয়া কামনা।
হেন মনে অভিলাষী　　　কহি তবে পরকাশি
তুয়া পায়ে নিছিয়ে আপনা ॥

স্বরূপের গান শেষ হওয়া মাত্রই মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ এযে অমৃতের অমৃত! অবরুদ্ধ প্রস্রবণ হইতে সহসা যেন অমৃতের উৎস উছলিয়া উঠিল! অনুরাগের প্রাবল্যে অনুরাগিণী শ্রীমতীর হৃদয় কিয়ৎক্ষণ অবরুদ্ধ ছিল—উহার প্রথম বেগ সরিয়া যাওয়া মাত্রই সেই কমকণ্ঠ হইতে কোমল কমনীয় মধুর ধারা প্রবাহিত হইল, শ্রীমতী হৃদয় খুলিয়া বলিতেছেন—"হৃদয়েশ্বর, জীবিতবল্লভ, প্রাণের নাগর, রসিক সুজন, আমার প্রাণের কথা শুন—আমি আর তোমা ছাড়া হইয়া থাকিতে পারি না। তোমার মুখখানি তিলার্দ্ধকাল না দেখিলে আমার মনে হয় যেন কোটিকল্পকাল চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া তোমার সহিত দেখা হয় নাই, সে যে কি যাতনা, বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তোমার প্রতি নব অনুরাগে ঘর ঘরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া আমিই তোমায় দেখিতে-

আগে চলিয়া আসিলাম, কত বাধা পায়ে ঠেলিয়া আসিয়াছি। পথ দেখিয়াই পরাণ আকুল হইয়া উঠিল। পথে অনন্ত বিঘ্ন, অনন্ত যাতনা—কিন্তু তাহা অনুভবেও আনিতে পারি নাই, এখন তোমার দর্শন পাইয়া সকল দুঃখই দূরে গেল। পরাণ-বন্ধু, আমার অবস্থা তোমায় কি বলিব, আমি দুঃখিনী, পরবশা, তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুগঞ্জনা! গৃহের ভিতর হইতে বাহির হওয়ার যো নাই, পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় অবরুদ্ধ, সদাই ভয়ে ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু অনেক পুণ্যের ফলে কত কামনা করিয়া বন্ধু তোমায় আজ পাইয়াছি। মনের কথা খুলিয়াই বলি, আজ তোমার চরণে আমি আমার জীবন-যৌবন সকলি নিছিয়ে ফেলি, ইঁহাই মনের অভিলাষ।” স্বরূপ, প্রেমময়ীর সরল প্রাণের কি সরল সুমধুর সরস ও স্বাভাবিক আত্ম-নিবেদন! কি বল স্বরূপ?

স্বরূপ। হাঁ—প্রভু। ইহাই ব্রজরসের খাটি ভাব ও খাটি ভাষা।

মহাপ্রভু। শ্রীমতীর এই নিবেদন শুনিয়া রসিকশেখর শ্যাম-সুন্দর কি বলিলেন?

স্বরূপ। তিনি বলিলেন—

শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর নিবেদন।
তোমার অদ্ভুত গুণে সদা করে আকর্ষণে
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমার মধুর বাণী সুধাসিন্ধু তরঙ্গিণী
মোর কর্ণ তাহে ডুবি থাকে।

তোমার ও গৌর দেহ পরম সুগন্ধি সহ
উনমত করিল আমাকে ॥
সখাগণ সঙ্গে থাকি সুবল তাহার সাথী
তোমা বিনা আন নাহি ভায়।
বিরলে বসিয়া যবে তোমারে দেখিয়ে তবে
কহ তুমি আমার উপায় ॥

মহাপ্রভু। হাঁ, স্বরূপ, হলো বটে, কিন্তু তেমনটী হলো না। হাজার হইলেও পুরুষ !

উৎকণ্ঠা

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব। শ্রীমতীর কোমল মধুর নিবেদনের সুখময়ী স্মৃতি তাঁহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্ফুরিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু বলিলেন—"স্বরূপ, মনে করিয়াছিলাম তোমাদিগকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম দিব, কিন্তু তাহা ঘটিল না। অভিসারের কথা শুনিলাম, অভিসারের মিলনের কথাও শুনিলাম, কিন্তু আর একটি কথা মনে পড়িতেছে, তাহাও কিছু শুনিতে চাই। বলিয়াছি তো আমার এ তৃষ্ণার শান্তি নাই। শ্রীমতী এত যাতনা সহিয়া অভিসার করিলেন, সে অভিসারের যাতনা বর্ণনা করিতে গিয়া তোমারও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, এরূপ যাতনার পর মিলন অতি প্রয়োজনীয়, আর এ অবস্থায় মিলনও বড় মধুর। কিন্তু এই দুরন্ত যাতনাময় অভিসারের পর যদি শ্রীমতী নিভৃত সঙ্কেত নিকুঞ্জকুটীরে আসিয়া শ্যামসুন্দরকে না পাইয়া তাঁহার

আশায় প্রতীক্ষা করিতেন তবে তাঁহার আরও কি যাতনাময় অবস্থা ঘটিত।

স্বরূপ। প্রভু সে ব্যাপার অতি নিদারুণ, কিন্তু প্রেমরসময়ের প্রেম-লীলার এমনই গূঢ় গভীর রহস্য, যে তাহাও ঘটে।

একদিন শ্রীমতী সঙ্কেত-কুঞ্জ-কুটীরে অভিসার করিলেন। আজ যেমন বর্ষার ঘনঘটা ও ঘোরতর আড়ম্বর সে দিবস তেমনি ছিল না, কিন্তু রাত্রিকাল তো। কত বিঘ্ন-বিপত্তি পায়ে ঠেলিয়া কত যাতনা সহিয়া শ্রীমতী সখী-সঙ্গে শ্যামসুন্দরের দর্শন-লালসায় কুঞ্জ-কুটীরে আসিলেন, আসিয়া দেখেন, শঠশিরোমণি তখনও আসেন নাই। শ্রীমতী ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিলেন, বন্ধুর জন্য কুসুমশয্যা বিরচন করিয়া দীপ জ্বালিয়া বসিয়া রহিলেন, দণ্ডের পর দণ্ড অতি-বাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? যাহার লাগিয়া লজ্জা ভয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী এই ঘোর নিশীথে বনে আসিলেন—সে কৃষ্ণ কোথায়? শ্রীমতীর বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ঃ—

কথিত সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজন-বচন-বঞ্চিতা॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসম-শর-কীলিতম্॥
মম মরণমেব বরমতি বিতথকেতনা।
কিমিতি বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥

মামহহ বিধুরয়তি মধুর-মধুর-যামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহুদূষণম্॥
কুসুম-সুকুমার-তনুমতনুশর-লীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া॥
অহমিহ নিবসামি ন গণিত-বন-বেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা॥
হরি-চরণ-শরণ-জয়দেব-কবি-ভারতী।
রসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল কলাবতী॥

স্বরূপ ব্যাকুলকণ্ঠে এমন ভাব-রসে জয়দেবের এই পদটী গান করিলেন, মনে হইল যেন স্বয়ং শ্রীমতী স্বরূপের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আপন যাতনা বিনাইয়া বিনাইয়া প্রকাশ করিতেছেন।

মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"রামরায়—শ্রীমতীর অবস্থা দেখ, যাহার দর্শন ও সঙ্গ-লাভের জন্য তিনি এত যাতনা সহিয়া নিভৃতকুঞ্জে উপনীত হইলেন, মালা গাঁথিলেন, কুসুম-শয্যা রচনা করিয়া যাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন, তিনি আসিলেন না; —তাই অধীরা হইয়া বলিতেছেন—"সখি এখন বল দেখি, আমার উপায় কি? এখন কাহার শরণ গ্রহণ করি? তোমরা আশা দিয়েছিলে,—গগনে চাঁদ উঠিতে না উঠিতেই হরি আসিবে, দেখ গগনে চাঁদ উঠিয়াছে, কিন্তু সখি আমার হৃদয়াকাশের শ্যামচাঁদ তো এখনও দেখা দিল না। হরি আমার মন চুরি করিয়া পালা-

ইল, আর বুঝি এ বনে আসিবে না, তা'হলে আর আমার এই অমল রূপ-যৌবনে ফল কি? তোমাদের কথায় তো আর বিশ্বাস করিতে পারি না, তবে বল এখন কাহার শরণ লই? যাঁহার সঙ্গ-লাভের জন্য এই ঘোর যামিনীতে এই গহন কাননে আসিলাম, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে মদনশর বিদ্ধ করিয়া কেবল ক্লেশ দিলেন। সখি, এখন আমার মরণই ভাল, আর এ ব্যর্থদেহে বিরহের আগুন কি জন্য সহিব? হরি এখনও এল না, কেবল ইহাতেই আমার চিত্ত অধীর হয় নাই। আমার মনে হইতেছে, আমি অতি দুর্ভাগা, আমি কোন্ পুণ্যে তাঁহাকে পাব? সুকৃতি না থাকিলে কি তাকে পাওয়া যায়? যাহার সুকৃতি আছে, সেই কামিনী তাহাকে পাইয়াছে, তাই তার আসা হয় নাই। হরি তাহার সহিত কেলি-সুখে নিমগ্ন আছে। মধুর যামিনীতে সকলেরই সুখ, কেবল এই দুর্ভাগিনীরই এই যাতনা!"

"যদি শ্যামসুন্দর না আসিল, তবে আর আমার এ বলয়াদিভূষণে প্রয়োজন কি? হরি-বিরহ-অনলে যাহার দেহমন নিরন্তর দগ্ধ হয়, তাহার আবার ভূষণের কি প্রয়োজন? আমার গলার ফুলের মালাও এখন আমার জ্বালার কারণ হইতেছে, ইহাও আমি গলে ধারণ করিতে সমর্থ নই। অনঙ্গশরের প্রভাব দেখ, আমার দেহ ক্ষত না করিয়াও কত যাতনা দিতেছে। আর আমার বুদ্ধি দেখ, হরি আমায় মনেও করে না, অথচ আমি এই বনে বসিয়া রহিয়াছি।" এই বলিয়া শ্রীমতী রোদন করিতে লাগিলেন।

রামরায়, শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা বাস্তবিকই সহ্য করা যায় না।

১০

উৎকণ্ঠার সহিত একটা তীব্র অসহিষ্ণুতার ভাব মিশিয়া শ্রীমতীকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে, কি বল রাম রায়?

রাম রায়। হাঁ, প্রভু। জয়দেবের এই পদটী বসন্তকালের জন্য বিরচিত, এই সময়ের উপযোগী নয়।

স্বরূপ। তাহা তো পূর্ব্বে বলিয়াছি। রায় মহাশয়, এখন আর একটি পদ শুনুন:—

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ পাতশত
আরো কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতী গৌরব বামচরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার॥
সজনি কি ফল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলন কান॥
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু পিরীতি-অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল
ভাও ভুজঙ্গিনী পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।"

গাইতে গাইতে স্বরূপ নীরব হইলেন।

রাম রায়। এ পদটী ভাবময় ও মনের মত। প্রভু কি বলেন?

মহাপ্রভু। বাঙ্গালীর প্রাণের কথা বাঙ্গালা ভাষাতেই খোলে ভাল।' তবে আধ বাঙ্গালাতেও মধুরতা আছে।

রাম রায়। তাত বটেই, তা ছাড়া আরও কারণ আছে। প্রেমময়ের প্রেম-প্রবাহ বাঙ্গালদেশে অধিকতর খরবেগে প্রবাহিত। বাঙ্গালার কবিরা যেন শ্রীব্রজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী! যেমন ভাব, তেমনই ভাষা,—উজ্জ্বল ও মধুর। আধ বাঙ্গালা হইলেও পদটী আমার প্রাণে লাগিয়াছে।

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার মনের মত আরও একটি পদ আছে। আমি অত সহজ কথায় শঠশিরোমণি শ্যামচাঁদকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। রায় মহাশয়, আমার মনের মত পদটীও শুনুন :—

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইনু
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এতদিনে সখি নিশ্চয়ে জানিনুঁ
নিঠুর পুরুষ জাতি॥
মেঘ দুরুদুরু দাদরীর বোল
ঝিঝাঁ ঝিনিঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজরীর ছটা
হিয়ার পুতলী দোলে॥
যতনে সাজানু ফুলের সাজ
গন্ধে মোহ-মোহ করে।

অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ-জ্বরে ॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর ঐছন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে ॥

রায় মহাশয় এই গানটী ঠিক নয় কি ? কেবল কালের অবস্থার উপযোগী বলিলে চলিবে না, শ্রীমতীর ভাবের অবস্থারও উপযোগী হওয়া চাই। শ্রীমতীকে সঙ্কেতস্থলে এত যাতনা দিয়া আনিয়া যথাসময়ে দর্শন না দেওয়া কি সুজনের কর্ম্ম ? শ্রীমতী কোমল-কুসুম-শয্যা রচনা করিলেন। শ্যামের গলে দিবেন বলিয়া, কুসুম সাজে তাঁহাকে সাজাইবেন বলিয়া ফুল তুলিলেন, মালা গাঁথিলেন, তাঁহার আসার আশায় সারানিশি প্রভাত করিলেন, কিন্তু শঠশিরোমণি আর আসিলেন না, তিনি যার জন্য এত ক্লেশে অভিসার করিয়া নিভৃত কুঞ্জে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন, তিনি তাঁহাকে একটিবার মনেও করিলেন না ! বলুন দেখি—এ কেমন নিঠুরতা ! ইহাতে কাহার মনে সন্দেহ না হয়। শ্রীরাধা আগে জানিতেন না, যে যাঁহার জন্য তিনি কুল-মান-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য সকল ত্যাগ করিয়াছেন, সকল ত্যাগ করিয়া নিশীথে বনে আসিয়াছেন—তিনি সুধু নিঠুর ও শঠ নহেন, তিনি বহুবল্লভ। কি অনর্থ ব্যাপার !

মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ঠিক কথাই স্বরূপ। ইহাতে অনর্থ না হইবে কেন ? সহিষ্ণুতারও একটী সীমা আছে।

স্বনায়িকা সকলই সহিতে পারেন—লোকচর্চ্চা, গুরুগঞ্জনা, অবমানের শত ধিক্কার, অনিদ্রা, অনাহার, অনল-অনিল-বর্ষা-বানের উপদ্রব—সকলি হাসিতে হাসিতে সহিতে পারেন, কেবল সহিতে পারেন না—শঠতা ও অন্যসঙ্গাশঙ্কা। ইহাতে যে অনর্থ ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তার পরে কি হইল, স্বরূপ!

স্বরূপ। তার পরে শ্রীরাধা কুসুমশয্যা ও ফুলের মালা যমুনার জলে ভাসাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব মুঁই
সাধে নিরমিলুঁ আশা-ঘর।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইনু গো
সকলি বিফল হ'লো মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লয়ে গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগনে উপরে চাঁদ কিরণ উজর গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথি॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খর্পূর পুরিল মুঁই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব!

এমন মালতামালা বৃথাই গাথিনু গো
কেমনে বা জীউ গোঞাইব ॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধরহ বলি ধাইয়া চলিল গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে ॥

শ্রীমতীর এই উৎকণ্ঠা বর্ণনার ভাষা নাই। যাতনা কি কম? গভীর রজনী, তাহাতে বনভূমি; শ্যামের পথপানে চাহিয়া শ্রীরাধা দুকান পাতিয়া তাঁহার চরণ-ধ্বনির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, পাতার উপরে বৃষ্টি-বিন্দু পড়িয়া যে শব্দ হইতেছিল, সে শব্দেও তাহার মনে হইতেছিল—এই বুঝি কৃষ্ণ আসিলেন। কিন্তু কৈ? কৃষ্ণ কোথায়, দণ্ডের পর দণ্ড এইরূপ আশায়-প্রতীক্ষায়-উৎকণ্ঠায় চলিয়া গেল, কৃষ্ণ আসিলেন না। এত আশায় এত নিরাশ—শ্রীমতীর হৃদয় বলিয়াই এত সহিল—বুঝি পাষাণ হলে ফেটে যেত।" বলিতে বলিতে স্বরূপের বাক্য গদ্‌গদ্ হইয়া পড়িল, কণ্ঠ স্তম্ভিত হইল।

মহাপ্রভুর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ভাব সংবরণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"স্বরূপ, তার পর?"

স্বরূপ নয়ন জল মুছিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে গান ধরিলেন—

দুকাণ পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু পথ-পানে চাই।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই ॥

পাতায় পাতায় পড়িছে বাদল
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখলো সজনি
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে বাড়িয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি আর কেন সই
ভাসা গো যমুনা জলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চুবক চন্দন
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস ফুলহার-কলি
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দুর মুছি কর দূর
নয়ানের কাজর রেখা॥
আর না রাখিব এ ছার পরাণ
না যাব লোকের মাঝে।

স্থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিঠুর রাজে ॥

স্বরূপ রোদনের সুরে সুর মিশাইয়া নয়ন জলে গান শেষ করিলেন; রামানন্দ প্রভৃতি সকলেই ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিজের হাতে নিজ নয়ন জল মুছিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"স্বরূপ আর না,—আর শুনা যায় না। এ অবস্থায় কোন সখী অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া এ সংবাদ জানাইয়াছিলেন কি?"

স্বরূপ। এই দারুণ উৎকণ্ঠার সময়ে দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতেছিলেন, পথে দেখিতে পাইলেন, বহুবল্লভ ভীত-ভীত-ভাবে শ্রীরাধার কুঞ্জের অভিমুখে আসিতেছেন। দূতী ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধরে নিবসে ঘন শ্বাস।
করতলে বদন, সঘনে অবলম্বই
শুনি শুনি জীবন নিরাশ ॥
মাধব কাহে আশয়লি রামা।
সগরহি যামিনী জাগি পোহাইল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা ॥
হরি হরি! ধরণী ধরি উঠই ধনি
বোলত গদ গদ ভাখ!
নীল গগন হেরি তোঁহারি ভরম ভাবে
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ ॥

লাখ আশ-আশে লথই না পারিয়ে
রহ কি নাহি নিশোয়াস।
তোহারি নাম গুণে পুন তনু পুলকই
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥

মহাপ্রভু। নায়ক-চূড়ামণি অবশ্যই ভীত-ভীত ভাবে অপরাধীর ন্যায় শ্রীমতীর কুঞ্জ ঘরে উপস্থিত হইলেন!

স্বরূপ। হাঁ প্রভু! ভীত-ভীত ভাবে অপরাধীর ন্যায়ই বটে! সাহস করিয়া তিনি শ্রীমতীর মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, অবনত মস্তকে পদ-নখরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, শ্রীমতী আড়-নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টি করিলেন, দৃষ্টিমাত্রই দুঃখে, ঈর্ষায় ও রোষে তিনি একবারে মর্ম্মাহত হইলেন। যে অনুরাগ, অভিসারের আকারে সিন্ধু-প্রবাহের ন্যায় উধাও ভাবে শ্যাম পানে ছুটিয়াছিল, তাহাতে বাধা পড়িল। সে বাধার হেতু এই যে, প্রেম চায়—ষোল আনা প্রাণ—প্রেম ভাগাভাগি বুঝে না, যুক্তিতর্ক জানে না—অবকাশ অনবকাশ মানে না—অপরের মন-রক্ষার জন্য শিষ্টতা, ভদ্রতা বা কর্ত্তব্যতা পালন প্রেমের নিকট স্থান পায় না। লোকে কথায় বলে—

প্রেমের সদাই অভিমান।
প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ॥

শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ প্রেমে শ্রীমতীর সন্দেহ হইল, সন্দেহের কারণও স্পষ্টরূপে সূচিত হইল, তিনি আড়-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের তনু দেখিয়াই তাহা বুঝিয়া লইলেন। সুতরাং শ্যাম-দর্শনের অভিসার-স্রোতে

বাধা পড়িল। তাহাতে অভিসারের চরম গতির প্রতিবন্ধ হইল বটে—মিলনে বাধা জন্মিল বটে, কিন্তু শ্রীমতীর অন্তরে সেই অবরুদ্ধ গতি স্ফীত হইয়া উঠিল। সিন্ধুগামিনী খর-প্রবাহিনী তটিনীর প্রবাহের সম্মুখে যখন সহসা কোন বাধা পড়ে, তখন প্রবাহের মূল-স্থানের গতিরোধ হয় না—সে বেগ অদম্য। কিন্তু বাধার স্থানে গতিরুদ্ধ হয়, তাহার ফলে অদম্যবেগে তটিনী বক্ষ স্ফীত ও উত্থিত হইয়া উঠে। অনুরাগ-প্রবাহের বাধাতেও প্রতিরুদ্ধ অনুরাগ হৃদয়ে স্ফীত হইয়া উঠে। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা এবং উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার অনুরাগ,—বহুবল্লভের এই ব্যবহারে—অপর আকার ধারণ করিল। উহারই নাম মান। ব্রজরসে মান এক চমৎকার ব্যাপার !"

মান

মহাপ্রভু আনমনা ভাবে শ্রীপাদ স্বরূপের মান-তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ শুনিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হওয়া মাত্রই মহাপ্রভু বলিলেন—"স্বরূপ, ওবার রথযাত্রার সময়ে তোমার মুখে ব্রজের মানের কথা কিছু-কিছু শুনিয়াছিলাম। সেই কথাগুলি আমার মনে হইতেছিল। তুমি ধীরাধীরা শ্রীমতীর বক্রোক্তির কথা শুনাইয়াছিলে—তখন তুমি বলিয়াছিলে,—

"ব্রজগোপীর মান হয় রসের নিদান।"

সে কথাটী আজ সহসা আমার মনে পড়িল। মানের সূচনা বলিতে গিয়া তুমি একটী গান করিয়াছিলে—

বাধা পড়িল। তাহাতে অভিসারের চরম গতির প্রতিবন্ধ হইল বটে—মিলনে বাধা জন্মিল বটে, কিন্তু শ্রীমতীর অন্তরে সেই অবরুদ্ধ গতি স্ফীত হইয়া উঠিল। সিন্ধুগামিনী খর-প্রবাহিনী তটিনীর প্রবাহের সম্মুখে যখন সহসা কোন বাধা পড়ে, তখন প্রবাহের মূল-স্থানের গতিরোধ হয় না—সে বেগ অদম্য। কিন্তু বাধার স্থানে গতিরুদ্ধ হয়, তাহার ফলে অদম্যবেগে তটিনী বক্ষ স্ফীত ও উত্থিত হইয়া উঠে। অনুরাগ-প্রবাহের বাধাতেও প্রতিরুদ্ধ অনুরাগ হৃদয়ে স্ফীত হইয়া উঠে। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা এবং উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার অনুরাগ,—বহুবল্লভের এই ব্যবহারে—অপর আকার ধারণ করিল। উহারই নাম মান। ব্রজরসে মান এক চমৎকার ব্যাপার!”

মান

মহাপ্রভু আনমনা ভাবে শ্রীপাদ স্বরূপের মান-তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ শুনিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হওয়া মাত্রই মহাপ্রভু বলিলেন—“স্বরূপ, ওবার রথযাত্রার সময়ে তোমার মুখে ব্রজের মানের কথা কিছু-কিছু শুনিয়াছিলাম। সেই কথাগুলি আমার মনে হইতেছিল। তুমি ধীরাধীরা শ্রীমতীর বক্রোক্তির কথা শুনাইয়াছিলে—তখন তুমি বলিয়াছিলে,—

“ব্রজগোপীর মান হয় রসের নিদান।”

সে কথাটী আজ সহসা আমার মনে পড়িল। মানের সূচনা বলিতে গিয়া তুমি একটী গান করিয়াছিলে—

"এস এস বন্ধু করুণার সিন্ধু
রজনী গোঙালে ভালে।
আমারে ছাড়িয়ে আন সুখ পেয়ে
ভালত সুখেতে ছিলে?

* * * *

কাঁদিয়ে যামিনী পোহালাম আমি
তুমি ত সুখেতে ছিলে?

এই গানটী গাইয়াছিলে তো?

স্বরূপ। হাঁ প্রভু। এই গানটীই বটে, আমারও মনে পড়েছে। কিন্তু এই ভাবের পরক্ষণেই শ্রীমতীর ভাবান্তর ঘটে, তিনি ঘৃণার ভাব দেখাইয়া আবার বলিলেন:—

"ছুঁইওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখ খানি দেখ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজ ভাল॥"

মহাপ্রভু। নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় কেমন বাঁকা কথা! তার পর, স্বরূপ?

স্বরূপ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিভ হইলেন, ভাব গোপন করিয়া নিজের অনুরাগ নিষ্ঠার ভাণ করিলেন, নানা কথায় শ্রীমতীকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সে সকল কথায় মানময়ী শ্রীমতীর

মন ফিরিল না। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন—"তুমি যে বহু-বল্লভ তাহা আমি অনেক দিন শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা পরের মুখে,—আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম—আর কেন? দূরে থেকেই তোমায় প্রণাম!—বুঝিলাম তুমি আমার নও,—তোমার ইঙ্গিতে আমি কুল-মান-ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-স্বজন-স্বধর্ম্ম সকল ত্যাগ করিলাম, তোমার জন্য ঘোর নিশায় এই ঘোরবনে আসিলাম—তোমায় পাইব বলিয়া। আর তুমি আমায় ভুলিয়া কোথায় ছিলে? এখন তোমায় চিনিয়াছি। দূরে থেকে তোমার পায় কোটি কোটি নমস্কার!—বুঝিয়াছি, তুমি নিশ্চয়ই আমার নও।" এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া মানিনী শ্রীমতী অধো-বদনে ফিরিয়া বসিলেন।"

মহাপ্রভু। তা শ্রীমতীর মান হইতেই পারে। কি বল, রাম রায়? "আমি তোমারই ইঙ্গিতে সকল ত্যজিয়া বনে আসিলাম, আর তুমি আমাকে একবারে ভুলিয়া গেলে!" এতে মান না হয় কার?

রামবসু। তা হলে প্রভু, সে মান তো আমাদেরও হইতে পারে। আমরা গৃহীলোক, গৃহ ফেলিয়া, গৃহের কাজ ফেলিয়া—সকল ফেলিয়া তোমায় দেখিতে এতদূর আসিয়াছি—আর তুমি তোমার আপন ভাবে বিভোর থাক, ভাল করিয়া আমাদের সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত কও না—বল দেখি আমাদেরই বা মান না হইবে কেন?

মহাপ্রভু। রাম বসু—আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমি তোমাদের নিকট অপরাধী—আমায় ক্ষমা করিতে হইবে।

রামবসু। ওকি কথা! এমন কথাও কি ভৃত্যাদিগকে বলিতে হয়। আমি একটা কথার কথা বলিলাম মাত্র। যাক্, আমার কথা ফিরাইয়া লইলাম। স্বরূপ ঠাকুর, আবার সেই মানের কথাই বলুন—

"অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে।"

স্বরূপ। সে এক বিচিত্র বিপরীত ব্যাপার। শ্রীমতীর মান ক্রমেই দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল, তিনি আর শ্যামসুন্দরের বদন পানে চাহিবেন না বলিয়া একবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন করিতে না পাইয়া তাঁহার নাম জপ করিয়াও সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করিতেন, আজ তিনি সেই প্রাণের প্রাণ হৃদয় বল্লভকে পদপ্রান্তে বসিয়া শত কাকুবাদ করিতে দেখিয়াও হৃদয়ে যেন মানের পাষাণ চাপাইয়া গুরু-গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ-নামের সাধা রসনা আজ উপেক্ষার সহিত কৃষ্ণনাম গ্রহণে নীরব। যোগীন্দ্র মুণীন্দ্রগণ মহাযোগ-সাধনায় যাঁহাকে খুঁজিয়া পান না, আজ ব্রজবালার চরণতলে পড়িয়া শত কাকুবাতেও তিনি তাঁহার মুখের একটি কথা শুনিতে আকুল! সে কথা আর এ মুখে কি বলিব, একটি গান করি, শুনুন;—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দর-তিমির-মতি ঘোরম্।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মান-মনিদানম্।

সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ-কমল-মধু পানম্ !
সত্য মেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর নয়ন-শর ঘাতম্ ॥
ঘটয় ভুজ-বন্ধনং জনয় রদ-খণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখ-জাতম্ ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নম্ ।
ভবতু ভরতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়-মতি যত্নম্ ॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
কৃষ্ণমিদ মেতদনুরূপম্ ।

* * * *

স্থল-কমল গঞ্জনং মম হৃদয়-রঞ্জনম্
জনিত-রতি-রঙ্গ-পর-ভাগম্ ।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণ-দ্বয়ং
সরস-লসদলক্তকরাগম্ ॥
স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ ।”

স্বরূপের গান শেষ হইতে না হইতেই রামবসু বিস্মিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন ঃ—“ওগো রায় মহাশয়, ও কিগো ?—একবারেই পায়ে ধরা !

রাম রায়। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাই তো দেখ্‌ছি! একি গো স্বরূপ ঠাকুর মহাশয়?

স্বরূপ। তা কি আর কারো জানা নাই—এ যে প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত!

মহাপ্রভু। কেবল পায়ে ধরিয়াও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই; কুঞ্জ হইতে বহিষ্কার পর্য্যন্ত!

রাম বসু। শ্রীমতীর মান কি দুর্জ্জয়!

রাম রায়। মান দুর্জ্জয় বটে, কিন্তু মানের হেতুটাই বা কম কি সে! রাজনন্দিনী আপন মান-সম্ভ্রম কুল-শীল ও লজ্জাদি ত্যাগ করিয়া, নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ সহিয়া, শত বিপদ্ মাথায় লইয়া উঁহাকে একটুকু দেখিবার জন্য ঘরের বাহির হইলেন। আর উনি কি না সারা রাত্রির মধ্যে উঁহার খোঁজ লইলেন না?—একি কম অপরাধ! ইহাতে পায়ে ধরাটা কি বড় বেশী প্রায়শ্চিত্ত? ব্রজ-রসের প্রণালীমতে সে ত উঁহার কর্ত্তব্যই।

স্বরূপ। উঁহার যে সেটুকু কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি আছে, ইহাও প্রশংসার বিষয় নয় কি?

মহাপ্রভু। না স্বরূপ, ত হ'লে হলো না। সুধু কর্ত্তব্যতায় পা-ধরা,—শুকন পায়ধরা মাত্র। শ্যামচাঁদ স্পষ্টতঃই বুঝিয়াছিলেন যে তিনি শ্রীমতীর কোমল প্রাণে অনর্থক আঘাত দিয়া তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিয়াছেন,—এই নিমিত্ত শ্রীমতীর মর্ম্ম যাতনা হইতেও তাঁহার মর্ম্ম বেদনা অধিক হইয়াছিল। তাই তিনি প্রেমের দায়ে অপ-রাধীর ন্যায় শ্রীমতীর চরণে পড়িয়া নয়ন জলে তাঁহার চরণ ধোয়াইয়া

দিয়াছিলেন। ত্রিলোকপতি হইয়াও তিনি ভক্তির বশ—প্রেমের বশ, ইহাই তাঁহার বিশাল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও মহামাধুর্য্য। স্বধু দয়া যাঁহার আছে, তাঁহারও এস্থলে চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আর যিনি দয়াময়, প্রেমময় ও রসময় তাঁহার পক্ষে এরূপ স্থলে চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা অতি সুন্দর ও অতি মধুর!

রাম বসু। ঠিক কথাই তো প্রভু। তা তিনি বেশ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীমতী তখন আপন বন্ধুকে ধরিয়া না তুলিলেন কেন? শ্যামসুন্দরের প্রার্থনা এই—মানিনি, আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি মান করিও না, একটি কথা কও, আমি তোমার ঐ শ্রীমুখের একটি কথার ভিখারী। তুমি আমার জীবন, তুমি আমার ভূষণ, তুমি আমার ভব-জলধির রত্ন, তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই, কেবল সদয় হ'য়ে একটী কথা কও। তোমার চরণ আমার মস্তকের ভূষণ, অপরাধ করি নাই, জানি না আমার কি অপরাধ, যদি অপ-হয়ে থাকে তোমার চরণ দুই খানি আমার মাথায়? দাও, তোমার হাসিমাখা মুখখানি দেখিবার জন্য আসিয়াছি, ঐ হাসিমাখা মুখের একটি কথা শুনিতে ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছি, একটী কথা কও—আর আমায় চরণতলে স্থান দাও।"

এই বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন জলে নিজ গণ্ড ও শ্রীমতীর চরণ যুগল ভিজাইলেন, কিন্তু মানিনী ফিরিয়াও চাহিলেন না—তিনি নিজের চরণ টানিয়া লইয়া আবার ফিরিয়া বসিলেন, কিছুতেই তাঁহার দয়া হইল না। ইহার পরে আবার একবারেই শ্যামসুন্দরকে কুঞ্জের বাহির করিয়া দেওয়ার আদেশ!

স্বরূপ। হাঁ গো বসু মহাশয়—এ লীলার ইহাই মাহাত্ম্য। একজন যখন ডেকে ডেকে সারা হয়, ডাকিলেও কেহ সাড়া দেয় না, তখন সে মানে অভিমানে নীরব হয়,—তখন অপর পক্ষের ডাকাডাকির পালা আরম্ভ হয়। ব্যাকুল ভক্তের আকুল প্রাণের অবসন্নভাবে ডাক,—নীরব হইলেই ভগবানের ডাকের আরম্ভ। কিন্তু ভক্তের তখন আর সাড়া নাই—কৃতজ্ঞ ভগবান্‌ও ভক্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি নাছোড়বন্দ, আবশ্যক হইলে ভক্তের দ্বারে দ্বারী হন, পায়ে মাথা কুটিতেও পশ্চাৎপদ নহেন—ভক্ত সম্বন্ধেই যখন তাঁহার এই নিয়ম, মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেমের আর কথা কি?

রামবসু। ঠাকুর, তা যেন হলো। কিন্তু কুঞ্জের বাহির করিয়া দেওয়া কেন?

স্বরূপ। ইহাকেই বলে দুর্জ্জয় মান! প্রেম যেখানে যত গভীর, মানের তরঙ্গও সেখানে তত অধিক। মহাপ্রেমে মহামান—কথায় কথায় মান—কারণে অকারণে মান!—আর সে মহামানে মহাতরঙ্গ। আর সেই তরঙ্গের অভিঘাতেই বহিষ্কার! কিছুই নিয়ম ছাড়া নাই।

মহাপ্রভু। লোকে জানে রসে নিয়ম নাই, কিন্তু স্বরূপ বুঝাইলেন—রসেও নিয়ম আছে। বসু মহাশয় প্রবোধ পাইলে ত।

রামবসু। কথা ঠিক—কিন্তু ব্যাপার অতি নিদারুণ, অতি অসহ। কুসুম-কোমলা সখীরা তো দয়াময়ী, তাঁহারা শ্যামসুন্দরের পক্ষে কোন কথাই কি বলিলেন না?

স্বরূপ। তা কি তাঁহারা কম করিয়াছিলেন। শ্যামচাঁদ

১১

বিতাড়িত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে সখীদের করে ধরিয়া কত অনুরোধ করিলেন—কিন্তু সে দুর্জ্জয় মান কিছুতেই ভাঙ্গিল না। শ্যামসুন্দর শ্রীরাধাকুণ্ডের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দশা দেখিয়া সখীদের মর্ম্মে দারুণ আঘাত লাগিল। ললিতা শ্রীমতীর নিকটে আসিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন :—

রামা কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে শরণ সো হরি
অবহুঁ না মিটে মান॥
গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কন
মানয়ে গুরুয়া ভার॥
কালিয়-দমন করিল যে জন
চরণ-যুগল-বরে।
এবে সে শ্রীহরি পদতলে পড়ি
তুহার চরণ ধরে॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর বরিখন বিনে
না পিয়ে তাহার নীরে॥
যদি দৈব দোষে অধিক পিয়াসে
পিবয়ে হেরিয়া থোর।

তবহুঁ তাহারি নাম সোঙরিয়া
গলয়ে তাহার লোর ॥
শুন গো সজনি শ্যাম-বিনোদিনী
কি আর করহ মান।
তুয়া অনুগত শ্যাম-মরকত
তো বিনু ভাবে না আন ॥

তখনও শ্রীমতীর মানের শান্তি হইল না। তিনি রুষ্টভাবে বলিলেন—"সখি, আর তোমরা উহার নাম করো না, আমার মান-কুল-শীল-ধর্ম্ম নকল নষ্ট হইল, শেষে আমার এই দুর্দ্দশা! আর তোমরা উহার কথা মুখে এনো না, তা হ'লে আমায় আর এখানে দেখিতে পাইবে না।" এই বলিয়া শ্রীমতী অধোবদনে কাঁদিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিশাখা আসিয়া বলিলেন—"সখি, আর তোমায় অবগুণ্ঠন টানিয়া অবনত বদনে কাঁদিতে হইবে না। শ্যামসুন্দর কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে, আর কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না, বোধ হয় আর আসিবে না। এখন স্থির হও।"

রামবসু। যেখানে যেমন আবশ্যক। শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলায় সখীদের অদ্ভুত কর্ত্তৃত্ব; ভাঙ্গিতেও পটু, আবার গড়িতেও পটু। ভাল, তারপর!

স্বরূপ। "শ্রীকৃষ্ণ আর আসিবেন না", শুনা মাত্রই শ্রীমতী অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন—"বলিস্ কি সখি, আর কি সে আসিবে না, সে কি একবারে আমায় ছাড়িয়া চলে গেল!

যে আমায় এত ভালবাসে, সে কি এক কথাতেই আমায় ছেড়ে গেল? তোরাইত বলিস সে গোবর্দ্ধন ধরিয়া ব্রজ-রক্ষা করেছিল, সে গোবর্দ্ধন ধরিতে পারে, সে কি অবলা-বালার একটু মান সহিতে পারে না। আর তোরাই বা কেমন, আমি অবোধিনী কি করে-ছিলেম, বা কি বলেছিলেম, বলি তোরাও তো ছিলি! তাকে যেতে দিলি কেন? এখন বা সখী যা, ত্বরায় তাকে নিয়ে আয়! আনিয়া আমার প্রাণ রাখ্।"

রামবসু! সখীদের কি শঙ্কট!

মহাপ্রভু। শঙ্কটও বলিতে পার—আনন্দ-রঙ্গও বলিতেও পার। ইহাই সখীদের কাজ!

রামবসু। কাজ বড় মন্দ নয়—শ্রীপাদ স্বরূপ, তারপর?

স্বরূপ। তারপর বিশাখা কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিষণ্ণভাবে শুষ্কমুখে বলিলেন, আর "কি পাওয়া যায়!—এত অপমানেও কি কেহ প্রাণ রাখে! নিজে অপ-রাধীর ন্যায় গলে বস্ত্র লইয়া শ্যাম ভীত-ভীতভাবে আসিল—কাঁদিল, চরণে পড়িল, তবু মান ভাঙ্গিল না, দুদণ্ড উহাকে এখানে তিষ্ঠিতে দিলে না, কুঞ্জের বাহির করিয়া দিলে—দুঃখে অপমানে মনের যাতনায় এখন কোথায় চলে গেছে, কি হইয়াছে, আমরা তাকে আর কোথা পাব?"—

আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
গলে পীতবাস লৈয়া!

সে চাঁদ বদনে ফিরে না চাহলি
তু বড় কঠিন মেয়া ॥
সো শ্যাম-নাগর জগত দুল্লর্ভ
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে তার ॥
তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক
তাহে ময়ুরের পাখা।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥
অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল যতনে আপনি
হানিলি আপন বুকে ॥
মনের আগুন মরহ পুড়িয়া
নিভাইবে আর কিসে।
শ্যাম-জলধরে আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

কলহান্তরিতা।

শ্রীমতী এ সংবাদে একবারে মর্ম্মাহত হইলেন, তাহার দুঃখের ও অনুতাপের আর সীমা রহিল না। সহসা যেন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন,—"সখি, আমি একি করিলাম, আমার একি দুর্ম্মতি হইল—অঞ্চলের ধন অযত্নে অনাদরে দূরে ফেলিলাম। আমার না হয় দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল, কিন্তু তোরাও তো ছিলি—আমার এত সাধের ধন হেলায় হারাইলাম"—এই বলিয়া শ্রীমতী বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

বসু রামানন্দ বলিলেন—"ব্যাপার এইরূপই বটে। শ্রীপাদ, এ সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের একটি পদ আমার মনে হইল, সেটি এই :—

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর-শেখর
কাঁহা সখি করল পয়ান॥
তপ বরত কত করি দিন-যামিনী
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্য ধন মঝু পদে গড়ায়ল
কোপে মুঁই ঠেলিনু পায়॥
আরে সই কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সে হেন পিয়া
অতি ছার মানেরি দায়।

জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড় চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া॥

মহাপ্রভু গান শুনিয়া বলিলেন, এও এক বিষম দায়! যে এত অত্যাচার করে, এত জ্বালা দেয়—তাহার একটুকু প্রতিশোধ দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। যাহাকে মানে মানে বিদায় দেওয়া হইল, এখন আবার তাহাকে এক মুহূর্ত্তের তরে না দেখিয়াই হৃদয় অধীর।

স্বরূপ। হাঁ প্রভু, শ্যামের সহিত মানের বাদে পরিণাম-ফল যে এত বিষময়, শ্রীমতী তাহা জানিতেন না। তাই শ্রীমতী বলিতেছেন :—

আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি হেরিনু
সো বহুবল্লভ কান।
আদরে সাধে বাদ করি তা সহ
অহর্নিশ জ্বলত পরাণ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনী রোখই
সো তাপিনী জগমাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥

ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস কহই সতী-ভামিনী
ঐছন কানুক লেহ॥

প্রভু, কানুর দোষ দেখিয়াও রোষ করার যো নাই, বরং রোষ করাই দোষ; উহার জন্য নিজকেই তাপিত হইতে হয়। কৃষ্ণ-প্রেমের এই এক জ্বালা চিরপ্রসসিদ্ধ:—

শঙ্খ বণিকের করাত যেমতি,
আসিতে যাইতে কাটে।

রায় রায়। ইহাতে সখীরা কি প্রবোধ দিলেন?

স্বরূপ। তাঁহারা প্রবোধ দিবেন কি, শ্রীমতীর উপরেই পাল্টা দোষ চাপাইলেন, যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা! ইন্দুরেখা দেবী নয়ন টানিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিতে লাগিলেন—

শুনইতে কানু- মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কহলাম তোয়।
ভরমহি ও সঞে লেহ বাঢ়াঅবি
জনম গোঙাঅবি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি, পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।

দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে ।
সো অব নয়ন-নীর দেই সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে ॥

সখি, কানুর মুরলী-রব মাধুরী শুনিতে তোমাকে পূর্ব্বেই তো মানা করিয়াছিলাম, তুমি আমাদের কথা তখন শুনিলে না ! তারপর তাহার হৃদয়াকর্ষি রূপ দেখিতে তোমার সাধ হইল, বিশাখা যখন তোমায় তাহার চিত্রপট দেখাইয়াছিল, আমি তোমায় হাত দিয়া নয়ন ঝাঁপিয়াছিলাম, তুমি আমার হাত তুলিয়া শঠের রূপ দেখিয়াছিলে ; তখনই বুঝিয়াছিলাম, যে এজন্য তোমায় সারাজীবন কাঁদিতে হইবে। গুণের পরীক্ষা না করিয়া পরের রূপ-লালসে দেহ সঁপিলে তাহার ফল এমনি করিয়াই ভোগ করিতে হয়। এখন দিনে দিনে নিজের রূপ গেল, দেহ গেল, জীবনই বা আর কয়দিন এভাবে থাকিবে ? শ্যাম-জলদ-রস-প্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপণ করিয়াছিলে, সেই প্রেম-তরু সজীব রাখার জন্য এখন নয়ন জল সেচন কর।”

ইন্দুরেখার কথা শেষ হইতে না হইতেই শ্রীরাধা বলিলেন— সখি, বন্ধুর সে সোহাগ আদরের কথা মনে পড়িতেছে, বন্ধু নিজ হাতে মালা গাঁথিয়া আমার চরণে পড়িয়া গলায় হার পরাইয়া দিতে সাধ করিয়াছিল, আমি মাথা অবনত করিয়া সে হার দূরে ছুড়িয়া

ফেলিলাম। সজনি, কেন আমার এ দুর্ম্মতি হইল? দারুণ মানে বন্ধু আমার আমায় ছেড়ে চলে গেল। গিরিধর শ্রীহরি আমার চরণ ধরে সেধে গেল, আর আমি পালটী তাহার দিকে চাইলাম না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম। এখন আমার আর রোদন ভিন্ন কি আছে? এখন সেই সুদুর্ল্লভ বহুবল্লভের দর্শনের জন্য দিবানিশি মন ঝুরিতেছে! এখন সখি, তাকে পাবার উপায় কি?"

এই বলিয়া শ্রীমতী ছল-ছল নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে সকলেই স্বরূপের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। স্বরূপের কথা শেষ হওয়া মাত্রই সকলেই মহাপ্রভুর মুখের দিকে চাহিলেন—চাহিয়া দেখেন, মহাপ্রভু বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন, তাহার বাহ্য-জ্ঞান নাই—মুখখানি বিবর্ণ ও অশ্রুসিক্ত। সে ভাব দেখিয়া সকলেই নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই নীরবতার মধ্যে এক অতি কোমল মধুর ধ্বনি সহসা সকলের শ্রুতিগোচর হইল—সে স্বর ক্রমে গানে পরিণত হইল—আকুল রোদনমাখা—গান! গান ক্রমেই পরিস্ফুট হইল :—

চরণ নখর-মণি-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।
কতরূপ মিনতি কয়লু পহু মোর॥
লাগল কুদিন হাম কয়লুঁ মান।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥

রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভাণ॥
নারী জনমে হাম না করলুঁ ভাগি।
মরণ শরণ ভেল প্রেম কি লাগি॥

অতি মৃদুলভাবে সুকোমল কণ্ঠে গানটী পরিসমাপ্তি হইল, কে গাইল, কোথা হইতে গাইল, তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না। গান থামিয়া গেল। কিন্তু সুরের ঝঙ্কার থামিল না,—ভক্তগণের সতৃষ্ণ নয়ন এদিকে ওদিকে গায়কের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোনও সন্ধান হইল না। মহাপ্রভুর নয়ন-ধারার বিরাম নাই, বাহ্য জ্ঞানেরও প্রকাশ নাই--ভক্তগণেরও বিহ্বল অবস্থা। আবার ঐ—ঐ সেই সুরের ঝঙ্কার—কোমল—অতি কোমল ও মধুর—কিন্তু অস্পষ্ট—যেন কোন সুদূর দেশ হইতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিতেছে—ক্রমেই স্পষ্ট—সুস্পষ্ট সেই আকুল রোদন মাখা গান!—

যা কর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মুরছয়ে কত কোটী কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেঁরনু হাম॥

আবার নীরব। কোথাও কোন সাড়া নাই—এমনই নিস্তব্ধ! রায় রামানন্দ একবার মাথা তুলিয়া গম্ভীরা-মন্দিরের ছাদের দিকে চাহিলেন—যুক্তিপূর্ব্বক নয়—অভ্যাস বশতঃ। কিন্তু কোথাও

কিছু নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার সেই কোমল কণ্ঠের ঝঙ্কার সকলের কর্ণে পৌছিল :—

"সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুল-নন্দন চাঁদ উপেখিনু
দারণ মান কি লাগি॥
কাতর দিঠে—"

গানের সুর আবার আকাশে মিলাইয়া গেল—কিন্তু উহার ঝঙ্কার সকলের হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঘুরিতে লাগিল। স্বরূপ ও রামানন্দ সকলেই স্তম্ভিত। এমন মাধুরীময় সুস্বরে গান আর কেহ কখনও শোনেন নাই – গান মৃদু মধুর অথচ স্পষ্ট। সকলেই কাণ পাতিয়া আবার সেই কণ্ঠ-রবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার সেই কোমল কণ্ঠ—

কাতর দিঠে মিঠ বচনামৃতে
কতরূপ সাধল মাহ।
সো হাম শ্রবণ সীম নাহি আনলুঁ
অব হিয়া তুষ-দহ-দাহ।
সো হেন রসিক পিয়া কাঁহা রহু কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর—

আরও একবার দীর্ঘ রোদধ্বনির ন্যায় গানের তান শুনা গেল—"সোঙরি সোঙরি মন ঝুর"— সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি হইল— "সে পহুঁ তোহারি অদূর"।-- এবার একবারেই নীরব। তথাপি ভক্তগণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিফল! আর সে মৃদু

মধুর তান শুনা গেল না। রাম রায় ও স্বরূপ মহাপ্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার নয়ন-কমল মুদিত, মুদিত নয়নের কোণ হইতে ঢরকে ঢরকে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, আর তাহাতে সেই পাণ্ডুর গণ্ড পরিষিক্ত হইতেছে।

রাম রায় স্বরূপের কাণের নিকট মুখ রাখিয়া অতি মৃদুভাবে বলিলেন – "শ্রীপাদ, প্রভু এখন লীলানুভাবে নিমগ্ন, একবারেই অন্তর্দ্দশা, শ্রীরাধাভাবে বিভোর। কিন্তু অতি বিস্ময়ের ব্যাপার—এই অশরীরি গান ! মানুষ দৈব-বাণী শুনিতে পায়, সে বাণী সুস্পষ্ট। কিন্তু এমন দৈবগানের ব্যাপার অতি বিরল।

স্বরূপ। বিরল বটে, কিন্তু আমাদের নিকট নূতন নয়। ছোট হরি দাস মহাপ্রভুর দর্শন-বিরহে প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণী-সঙ্গমে তনুত্যাগ করেন। তাহার পরে মধ্যে মধ্যে এখানে আমরা হরি-দাসের কোমল কণ্ঠের মধুর গীতি শুনিয়া বিস্মিত হইতাম—অবশ্যই আপনার তাহা মনে আছে।

রায় রামানন্দ উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন,—"হাঁ হাঁ ঠিক কথা ; আমার কেমন ভুল ! তাহা শুনিয়া আমরা কতই বিস্মিত হইতাম। ঘটনা কিন্তু অতি চমৎকার !"

স্বরূপ। এ সকল ঘটনা খুব বিস্ময়জনক বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে অলৌকিক বটে। আত্মা অনশ্বর,—আত্মাতেই ভাব ; ভাষা—ভাবেরই পরিস্ফুরণ। জড়ীয় কণ্ঠ ছাড়াও দিব্য কণ্ঠ আছে। সে কণ্ঠে অনুরাগী আত্মা আপন ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই, তবে অদ্ভুত

বটে। কেননা, এরূপ ঘটনা সতত প্রত্যক্ষ হয় না। হরিদাসের আত্মা প্রভুর জন্য ব্যাকুল। প্রভু তাঁহার গান শুনিয়া সুখী হইতেন, হরিদাস গান গাইয়া প্রভুর তৃপ্তি করিতেন—তাঁহার এই সেবা ছিল। হরিদাসের আত্মা তনুত্যাগ করিলেন,— কেননা সে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভুর দর্শন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আত্মার অনুরাগের পথে কোনও বাধা ছিল না। তনুত্যাগ করিয়া হরিদাস তাঁহার কোমল কণ্ঠে প্রভুর তৃপ্তিসাধনের জন্য অশরীরী হইয়াও আমাদের আশে-পাশে বিচরণ করিয়া গান করিতেন—সে গান আরও মধুর বলিয়া মনে হইত।

রাম রায়। ঠাকুর, তবে কি এ গান হরিদাসের ?

স্বরূপ। না, রায় মহাশয়, আমার তাহা কিছুতেই মনে হয় না। হরিদাস আমার নিকট গান শিখিতেন। তাঁহার কণ্ঠ আমার বেশ মনে আছে, সে কণ্ঠের তাল ও সুরবিলাসের কথাও ভুলি নাই। সে আমারই হাতের গড়া জিনিস। এ যাহা শুনিলেন, এ কোমল তান মর্ত্ত্যলোকে বা দেবলোকে সম্ভবপর নয়—যেন সাক্ষাৎ গোলোক হইতে এ সুধা-স্বর-লহরী ভাসিয়া ভাসিয়া আমাদের কাণে পহুঁছিয়াছে। কি সুন্দর, কি মধুর, একবারেই অশ্রুতপূর্ব্ব। মানুষের কণ্ঠে এ গান অসম্ভব, দেবকণ্ঠেও অসম্ভব। কি কোমল কমনীয় কণ্ঠের করুণ মধুর বিলাপ,—শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অথচ আরও শুনিতে সাধ হয়—এ যেন সাক্ষাৎ আনন্দময় ধামের অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুধা !

রামরায়। এবার বুঝেছি—অচিন্ত্য ব্যাপার ! মৃন্ময় জগতে

চিন্ময়ী-লীলা! মহাভাব-স্বরূপিণীর নিত্যলীলা! প্রপঞ্চে প্রকটতা! কি অদ্ভুত—কি কৃপা-মহিমা! ব্রজ-রসের অচিন্ত্যমাধুরী-স্রোত কোন্ সূত্র ধরিয়া কখন যে কি ভাবে প্রবাহিত হয় কে বলিতে পারে?

স্বরূপ। রায় মহাশয়—যদিও আমি ইহাতে বিস্মিত হই নাই, কিন্তু এরূপ ব্যাপার চিন্তার অতীত। কখনও মনে হয় নাই যে প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃত আনন্দধ্বনি অবতরণ করিয়া প্রাকৃত কর্ণের গ্রাহ্য হইবে।

রামরায়। ঠাকুর, আমার তো মনে হয় এই স্বর-লহরী প্রাকৃত কর্ণের শ্রবণবিষয় নহে, শ্রীভগবান্ দয়া করিয়া যাঁহাদিগকে দিব্য-শ্রুতি দিয়াছেন তাঁহারাই এ সঙ্গীত-শ্রবণে সমর্থ, ইহা শ্রবণ করা অন্যের সামর্থ্যাতীত। তা যা হোক, এখন ভাবমগ্ন প্রভুর ভাব দেখুন। মিলন-দর্শন ভিন্ন প্রভুর আকুল প্রাণে আর কিছুতেই শান্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

স্বরূপ। তাইতো বোধ হয়। তবে সেইরূপ একটী পদ গাইতেছি, শ্রীমতী বলিতেছেন :—

সো বহু বল্লভ সহজই তোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাহা আদর-ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ-তরঙ্গ॥
সখিহে কাঁহে উপেখিনু কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান॥

সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানি।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপিনু পরাণ॥
অব বিরহে তুহু সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হয় নিরবন্ধ॥

স্বরূপ করুণামাখা আর্ত্তিতে গানটী পরিসমাপ্ত করিলেন, গান শেষ করিয়া তিনি প্রভুর শ্রীমুখপানে নির্নিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন, সেই বিষাদমাখা ভাব—আর অবিরাম নয়ন-ধারা!

রামরায় বলিলেন—"শ্রীপাদ আর যে এখন স্থির থাকতে পারি না, প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডলের নিদারুণ বিরহ-যাতনার ভাব দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। সোণার বর্ণ মলিন হইয়াছে, মুখখানি অসিত-চতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে।"

স্বরূপ। বিপদের উপর বিপদ্—একেই তো ব্রজ-রসের মহা-ভাবময় বিগ্রহ—তাহার উপরে আবার কলহান্তরিতার জ্বালাময় করুণকাতর গোলোক-স্বর-লহরী—ভাবের উপর প্রগাঢ় ভাব—সহসা ইহার বিরাম সম্ভাবনা দেখি না। আমি আর াক করিতে পারি, তবে উহার চরণ-কৃপা। এই বলিয়া স্বরূপ মহাপ্রভুর নিকট-বর্ত্তী হইয়া মৃদু তানে আরও একটি গান আরম্ভ করিলেন :—

রাইক বিনয় বচন শুনি সো সখী
চললহি শ্যামক আগে।

দূরহি তাক বদন হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে ॥
অপরূপ প্রেমক রীত !
আদর বিনহি সোই বহুবল্লভ
দূতী নিয়ড়ে উপনীত ॥
দূতী কহত তুঁহু কৈছন পিরীতি-
রীতি বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল
তুঁহু কাহে আয়লি ছারি ॥
আপনক দোষ জানসি যদি মনমাহা
কাহে বাড়ায়লি বাত।
গোবিন্দ দাস তোহারি লাগি সাধব
আগে চলহ মঝু সাথ ॥

রামবসু। শ্রীপাদ, এ গানটীতে আমাদের প্রাণেও যেন আশার উদয় হইল। সম্ভবতঃ এ গানটীতে প্রভুর হৃদয়ে মিলন-ভাবের আবেশ আনিতে পারে।

স্বরূপ। ইহার পরে আরও দুই একটা কথার আবশ্যক। 'বসু মহাশয়, আপনি আমার নিকটে আসুন। মুকুন্দ খোলটী লও, খুব মৃদুভাবে বাজাইবে।

বসু রামানন্দ ও মুকুন্দ শ্রীপাদ স্বরূপের নিকটে আসিলেন, স্বরূপ আবার মৃদুভাবে গান আরম্ভ করিলেন—

১২

দূতীর বচন শুনি রসিক-শিরোমণি
আওল তাকর সাথ।
দূরে সঞে হেরি সোই বর নাগরী
অবনত করি রহু মাথ॥
করযোড়ি সাধয়ে কান।
"হাম তুয়া কিঙ্কর পড়িয়ে চরণ-তল
ত্যজ ধনি দারুণ মান॥"
এত কহি নাগর অন্তর গর-গর
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
হেরি সুধামুখী আকুল ভেল অতি
সো মুখ হেরি বিভোর॥
ছল ছল নয়ানে শ্যাম-কর-কিশলয়
ধরি কহে গদ-গদ ভাষ।
জলদে গোপনবিধু যৈছে উদয় ভেল
কহ যতুনন্দন দাস॥

গান-সমাপনান্তে স্বরূপ ও অন্যান্য পার্ষদগণ দেখিলেন, মহাপ্রভুর মুদিত কমল-নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে, নয়ন-যুগল প্রফুল্ল ও আনন্দপূর্ণ, কিন্তু তাহাতে বাহ্য জ্ঞানের লক্ষণ তখনও পরিলক্ষিত হইল না। একদৃষ্টে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন—সে দৃষ্টি প্রফুল্ল, আনন্দ-চঞ্চল—যেন দর্শনানন্দসুধা-বিভোর! কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু আধ-আধ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কণ্ঠে অতি মৃদুভাবে বলিলেন—
"ললিতে যেন প্রাণ পেলেম—

সখি, ছিছি দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধুরে হারায়ে ছিলাম।
শ্যামসুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়ে পরাণ পেলাম॥

কণ্ঠস্বর আরও পরিস্ফুট হইল, প্রভু গানের সুর ধরিয়া গাইতে লাগিলেন ঃ—

সই জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাইয়া॥
তোরা সখিগণ করহ সিনান
আনিয়া যমুনা নীরে।
আমার বন্ধুর যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে॥

গানটী শেষ হইতে না হইতেই স্বরূপ মহাপ্রভুর ভাব দেখিয় উচ্চকণ্ঠে হাসিতে লাগিলেন, সে হাসির রব সংক্রামক হইয়া উঠিল। মুকুন্দ দত্ত সে হাসিতে হাসি মিশাইয়া খোলের রব দশগুণ বাড়াইয়া তুলিলেন, গম্ভীরায় সহসা অট্টহাস্যের বন্যাপ্রবাহের তরঙ্গ ছুটিল। সে তরঙ্গরোলে মহাপ্রভুর আবেশ ভাঙ্গিল। ক্ষণকালের জন্য প্রভু একটুকু স্তম্ভিত হইলেন—এই অট্টহাসির কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, অবশেষে বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন—"স্বরূপ, আমি যেন গভীর স্বপ্নে বিভোর ছিলাম—এমন কি করিয়াছি, যে জন্য এই হাসির রোল উঠিয়াছে।"

ভক্তগণ নীরব হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখমণ্ডলে ও নয়নকোণে তখনও নীরব হাসির সুধা-তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল।

স্বরূপ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে দীর্ঘ স্বপনটী কি, আমরা শুনিতে পাইব কি ?

মহাপ্রভু। পাগলের স্বপ্নের কথা, উপহাসেরই বিষয়—কিন্তু সে বড় আনন্দ—আনন্দের অসীম অনন্ত পাথার! কি মনোহর মধুর মিলন ? প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই—স্বরূপ, তুমি মুকুন্দ ও বসু রামানন্দকে লইয়া একটি মিলনের গান কর, কিন্তু উচ্চ-কণ্ঠে নয়।

তখন অতি কোমল কণ্ঠে মিলন-গান আরম্ভ হইল—

রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মানমাহা আনন্দসিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান-রোদন হি ভোর।
কান্থ কমল করে মোছই লোর॥
মানজনিত দুখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহি দূরে রহ নরোত্তম দাস॥

স্বরূপ আনন্দের মধুর উচ্ছ্বাসে গান শেষ করিতেছিলেন। মুকুন্দ দত্তের খোলের রবে অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপনীত

হইলেন। স্বরূপ, মুকুন্দ, রায় রামানন্দ ও বসু রামানন্দ তাঁহাদিগকে লইয়া গম্ভীরা মন্দিরের প্রাঙ্গনে আসিলেন। আবার নূতন করিয়া মিলন-গান আরম্ভ হইল,—মহাপ্রভু স্বয়ং সে গানে যোগ দিলেন, তাঁহাকে মধ্যে লইয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন ও নর্ত্তনে মত্ত হইয়া পড়িলেন। মিলন-গানের মধুর রোলে গম্ভীরা মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল। মহাপ্রভুর প্রফুল্ল শ্রীমুখমণ্ডল দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনের পরে গোবিন্দদাসের ইঙ্গিতে কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল। ভক্তগণ প্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। গোবিন্দ একাকী প্রভুকে পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আক্ষেপানুরাগ।

রথযাত্রা দর্শন করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের কেহ কেহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গভোগ-বাসনায় ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত শ্রীনীলাচলেই ছিলেন। আশ্বিন মাসে তাঁহারাও মহাপ্রভুর আদেশে স্বদেশে গমন করিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলতা দিন দিন অধিকার বাড়িয়া উঠিল। দিবাভাগে কোন প্রকারে ভক্ত সঙ্গে অতিবাহিত হয়, রাত্রিতে তাঁহার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, অবশেষে বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া তরুণ বিরহিণীর ন্যায় বিনাইয়া বিনাইয়া "হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করেন।

একদিন সায়াহ্নে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্র-সৈকতে উপবেশন করিয়া একমনে কি ভাবিতেছিলেন, সঙ্গে রামানন্দ ও শিখি মাইতি, কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দদাস ও শ্রীপাদ স্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎ-কালের সায়াহ্নে সমুদ্রের তট স্বভাবতঃই অতি সুন্দর, সমুদ্র অতী-তের মহাসাক্ষী হইলেও যেন চির নূতন—চির তরুণ।

মহাপ্রভু স্থিরনয়নে সমুদ্র দর্শন করিতেছেন, সমুদ্রের নীল সলিল ও সৌম্য প্রশান্ত ভাব—সৈকতের নব-মাধুরী ও নীলাকাশের উজ্জ্বল নীলিমা—কে জানে তাঁহার হৃদয়ে কি ভাব জাগাইয়া তুলিল। তাঁহার নয়নযুগল দেখিয়া মনে হইল, যেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। রামানন্দ ও শিখি মাইতি মহাপ্রভুর এই ভাব দেখিতে দেখিতে এমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, যে স্বরূপ ও গোবিন্দ যে কখন আসিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। পাছে বা প্রভুর ভাবাবেশের ব্যাঘাত হয়, এই মনে করিয়া স্বরূপ ও গোবিন্দ চুপে চুপে সৈকতের উপরে উপবেশন করিলেন; কিছুক্ষণ পরে রায় রামানন্দ কি-জানি-কেন পশ্চাৎ দিকে তাকাইলেন, চাহিয়া দেখেন—স্বরূপ ও গোবিন্দ দাস।

স্বরূপ রায় মহাশয়কে ইঙ্গিত করিয়া কথা বলিতে নিষেধ করি-লেন। সম্মুখে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের দিগন্তপ্রসারী অনন্ত নীলিমা। সকলেই নীরবে ভাব-বিভোর শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-কমলের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-যুগল ক্রমেই অশ্রুসিক্ত হইল, অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া গণ্ডে পড়িল,

সায়াহ্নে রবির রক্তরাগে শ্রীমুখকমলের সে সময়ে যে শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। বিম্ব-বিড়ম্বিত ওষ্ঠযুগল কাঁপিতে লাগিল, যেন কিছু বলিবেন, অথচ কথা ফুটিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ পরে অতি মধুর আধ ফুটন্ত একটি শব্দ শুনা গেল—"তো—মা—র"। শব্দটী গানের সুরে বাহির হইল। নয়নের জল নয়নে শুকাইয়া গেল, ভাব সংবরণ করিয়া প্রভু মৃদুভাবে গান ধরিলেন—

"তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন শ্যামরায়।"

বংশীধ্বনির মত সে সুকোমল তান যেন নীলাম্বুধির উপর দিয়া অনন্ত পথে অনন্তকে লক্ষ্য করিয়া ধীর মৃদুল তানে বহিয়া চলিল। রামরায় স্বরূপকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন, প্রভুর অঙ্গুলি সঞ্চালিত হইতেছে, গানটী যেন কণ্ঠে সম্যক্‌রূপে ফুটিতে না পারিয়া অঙ্গুলিতে আসিয়া খেলা করিতেছে। আবার গানের সুর পরিস্ফুট হইল—

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন শ্যামরায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।

গানের তান আবার নীরব, কিন্তু উহার ঝঙ্কার পার্ষদগণের হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রভুর নয়ন নিমীলিত, কণ্ঠ নীরব—যেন মহাযোগীর মহা ধ্যান। নয়ন হইতে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল, শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া পড়ার মত হইল, দেখিয়া রায় রামানন্দ তাড়াতাড়ি প্রভুকে ধরিয়া বসিলেন। স্বরূপ চিরদিনই মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ। প্রভুর কণ্ঠ হইতেই যেন গানের তান টানিয়া গাইতে লাগিলেন—

শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি !
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখে ভরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশিদিন তোমারে বন্ধু পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ স্থির করি॥

শ্রীপাদ স্বরূপের গান শেষ হওয়া মাত্র বসু রামানন্দ ব্যগ্রভাবে বলিলেন "শ্রীপাদ যাহাতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হয়, তাহার উপায় করুন। সমুদ্র-সৈকতে ধূলি-ধূসরিত শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া বড় যাতনা হইয়তছে—দেখিতে প্রাণ বিদীর্ণ হয়।"

গোবিন্দ বলিলেন--"বসু মহাশয় এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করার জন্যই বুঝি বিধাতা আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন !"

রায় রামানন্দ নিজের হাতে নিজের নয়ন জল মুছিতে ছিলেন, আর এক একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ছিলেন। স্বরূপ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"যত্ন করিলেই এ আবেশ ভঙ্গ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতেই উঁহার আনন্দ। উনি আবেশে আবেশে লীলারস আস্বাদন করেন। যখন আমরা চেষ্টা করিয়া উঁহার ভাবাবেশ ভঙ্গ করি, তখন উঁহার যাতনা অধিকতর বৃদ্ধি হয়। উনি এই অবস্থায় অনেকবার বলিয়াছেন—

"কেন বা জাগালে মোরে বৃথা কষ্ট দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের রূপ না পাইনু দেখিতে॥"

উঁহার আনন্দেই আমাদের আনন্দ। স্বয়ং শচীমাতাও ইহা বুঝিয়াছিলেন। তা না হ'লে কি তিনি উঁহাকে সন্ন্যাস করিতে অনুমতি দিতেন? অল্পক্ষণ পরেই প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইবে। ততক্ষণ আমরা আর দুই একটি গান করি—কি বলেন বসু মহাশয়?"

রাম বসু। তবে তাহাই হউক। আক্ষেপানুরাগের ভাবই বোধ হয় এখন প্রভুর হৃদয়ে প্রবল।

স্বরূপ। যে গানটী শ্রীমুখ হইতে নির্গলিত হইতেছিল, উহা হইতে তো তাহাই বুঝা যায়। আক্ষেপানুরাগেরই আর একটি পদ গাইব?

রাম বসু। "রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥"

এই পদটী গাইবেন কি?

স্বরূপ। এটি গাইলেও হয়—কিন্তু আর একটী গান মনে করিতেছিলাম। সে গানটি এই :—

"কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে ছাড়িব কেমনে
সে হেন গুণের নিধি॥

রাম বসু। অতি উত্তম। লোকে পরিবাদকে ভয় করে, কিন্তু শ্রীমতী আদর করিয়া "কানু পরিবাদ" চাহিয়া ছিলেন! শ্রীরাধা-প্রেমের বলিহারি যাই। তার পরে কি?

স্বরূপ। তার পরের সকল কথায় কাজ নাই। দুই একটি কথা বলিতেছি—

হিয়া দর দর করে নিরন্তর
যারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে কি শেল পশিল
বল না কি বুদ্ধি করি॥
আমরা অথল হৃদয় সরল
কথায় ভুলিয়া গেনু।
পরের কথায় পিরীতি করিয়া
জনম কাঁদিয়া মনু॥

রামবসু। তাইতো শ্রীপাদ, গোপবালারা বিচার বিতর্ক করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন নাই। পরের মুখে উহার রূপের কথা শুনিয়াই উহাকে ভালবাসিয়াছেন। সরল-হৃদয়া ব্রজবালাদের প্রেমের জ্বালা দেখুন, উহারা পরের কথায় ভুলিয়া গিয়া প্রেম করিলেন—আর কাঁদিতে কাঁদিতেই উহাদের জীবন গেল! তবে কি কৃষ্ণপ্রেমে কেবলই দুঃখ!

স্বরূপ। এক হিসাবে তাই বই কি? পদকর্ত্তাও তাই বলেন :—

সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল দুখের ঘর॥

কিন্তু এ দুঃখেও তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম ছাড়িতে পারেন না। দীপ-শিখা-দহনে পতঙ্গ পুড়িয়া মরে, তথাপি দীপ-শিখার দিকেই ধাবিত হয়।

রামবসু। অদ্ভুত কৃষ্ণানুরাগ; পরম অদ্ভুত। আমাদের বুড় ঘোষ মহাশয় গাইতেন :—

কাহারে কহিব মরম বেদন
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতি ঝুরি দিবা রাতি
সদাই চমকে চিত॥
সই ছাড়িতে নারি যে কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্কের ডালা।

স্বরূপ। শ্যামানুরাগের ঐ কথাই তো বটে। আমি কাশীতে যখন বেদান্ত পড়িতাম, শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার জন্য সহাধ্যায়ী দণ্ডীরা আমার কত উপহাস করিতেন, আমি বলিতাম :—

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব আমি শ্যাম চিকণ ধন॥

সে রূপ লাবণি মোর হিয়ায় লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে॥

রামবসু। শ্রীপাদ, আপনাকেও তা হ'লে "কানু-পরিবাদ" ভোগিতে হইয়াছে?

স্বরূপ। সে যোগ্যতা আমার কোথায়? সে ভাগ্য কি আমার সম্ভবপর? "কানু-পরিবাদ" ব্রজ-রসের অফুরন্ত ধন—অনুরাগের অপার সমুদ্র। শ্যাম-প্রেমের শেষ নাই। শ্রীমতী বলেন:—

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবু তো দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু॥

রামবসু। প্রভু এখনও অনুভবানন্দে বিভোর, শ্রীমুখকমল যেন আনন্দরসে উৎফুল্ল—আপনি এই সময়ে আর একটা গান করুন!

শ্রীপাদ স্বরূপ, বসু মহাশয়ের কথায় অতি মৃদুকণ্ঠে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া গাইতে লাগিলেন:—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

স্বরূপের কণ্ঠ হইতে শেষ চরণ শেষ হইতে-না-হইতেই প্রভু রোদনের সুরে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ, হৃদয়ের সখা" বলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। স্বরূপ যখন গান আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন প্রভুর

অর্দ্ধবাহ্য দশা। গানের প্রারম্ভেই তাঁহার চেতনার সঞ্চার হয়; রায় রামানন্দের গলা ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিতে লাগিলেন—"রামরায়, মনে করিয়াছিলাম শ্যাম-প্রেম-সুখ-সাগরে ডুবিয়া আমি প্রেমামৃত পানে প্রাণের জ্বালা জুড়াইব, কিন্তু আমার ভাগ্যে অমৃতের বদলে গরল উঠিল। স্বরূপ ঠিক কথাই বলিয়াছে—বন্ধু দেখা দিল, বাঁশীর স্বরে উদাসী করিয়া ঘরের বাহির করিল, কিন্তু এখন আর তাকে খুঁজিয়াও পাই না—মনে হয় বনে বনে ভ্রমণ করি, মনে হয় সমুদ্রের তটে পড়িয়া থাকি, যদি তাকে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু কৈ, সে মুরলীবদন—আমায় অকূলে ভাসাইয়া কোথা গেল। এখন দিবানিশি প্রাণ জ্বলিতেছে।"

স্বরূপ আবার গাইলেন:—

সখি কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চরিনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥

তখন শারদীয় সুনীল সান্ধ্য আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, চাঁদের জোছনা সিন্ধুসৈকতে সাগরের নীল জলে সুধা-মাধুরী ছড়াইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। এই সরলশুভ্রসৌন্দর্য্যেরও মহা-সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছেন—সপার্ষদ কনকগৌর শ্রীরাধাপ্রেমের

প্রকটমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! স্বরূপের গানে ব্যাকুল হইয়া প্রভু বলিলেন, "স্বরূপ, তোমার গানের তান আমার প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে, আর বাধা দিব না, তোমার সঙ্গীত-সুধা আমার তাপিত প্রাণের শেষ ভরসা। তারপর স্বরূপ ?"

স্বরূপের কণ্ঠ হইতে আবার সুধাস্রোত বিনির্গলিত হইল ঃ—

পিয়াস লাগিয়া জলদে সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥

মহাপ্রভু বলিলেন, "স্বরূপ, এত অল্প শুনিয়া কি তৃষ্ণা মিটে ? কৃষ্ণকথা স্বভাবতঃই মধুর—তোমার গানে লীলা-রস মূর্ত্তিমান্ হইয়া হৃদয় অধিকার করে। প্রশান্ত সিন্ধুর অনন্ত-বিসারী নীলিমার উপর দিয়া আমার নয়নযুগল কেবলই তাকে খুঁজিয়া আকুল হইতেছে যেন তাকে দেখিতে পাইয়াও হারাইয়া ফেলিতেছি, আর চিত্তের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। এই সময় যাপনের উপায় কি ?"

স্বরূপের সুধা-কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল, প্রভু ও ভক্তগণ ব্যাকুল প্রাণে শুনিতে লাগিলেন ঃ—

বিষের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহার লাগে॥

মীন লোভি মৃগী আনন্দে ধাইতে
ব্যাধ-শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগল মুখে ॥
নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক বারণ করিল পবন
কুলিশ মিলল শেষে ॥

মহাপ্রভুর ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া স্বরূপ সহসা নীরব হইলেন। রায় রামানন্দ বলিলেন—"তবে আর এখন গানের প্রয়োজন নাই।" প্রভু হাতের ইঙ্গিতে স্বরূপকে গান গাইতে আদেশ করিলেন। স্বরূপ গাইলেন—

ক্ষীর লাড়ু করি বিষ মিশাইয়
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকটে মরণ ভেল ॥

মহাপ্রভু কাঁদিয়া বলিলেন "হায় সরলা ব্রজবালা নিঠুরের হাতে পড়িয়া তোমাদের এই হইল! শ্যামের প্রেম যে সুধু অমৃত নয়—অমৃত মিশ্রিত বিষ—তোমরা ত তাহা জানিতে না। আর জানিলেই বা কি হইত, এ লোভ ত কেহ কখনও সংবরণ করিতে পারে না।

অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।

কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
শেষে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥

মহাপ্রভু এই বলিয়া "গোপী" "গোপী" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাম রায় সযত্নে প্রভুর নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "দয়াময় শান্ত হউন, আপনার ব্যাকুলতা দেখিলে আমরা কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারি না। এই দেখুন, বসু মহাশয় আপনার এই ভাব দেখিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন। আপনার চিরভৃত্য গোবিন্দদাস উন্মত্তের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন।"

এই বলিয়া রায় রামানন্দ প্রভুর নয়ন জল মুছাইয়া দিলেন। তিনি কি বলিয়া তাঁহার সান্ত্বনা দিবেন কোনও 'কথা খুঁজিয়া না পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু ভাব-সংবরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন। স্বরূপ বলিলেন, "প্রভু এখন চলুন, শ্রীমন্দিরে যাইয়া শ্রীশ্রীনীলাচল চন্দ্রের আরত্রিক সন্দর্শন করি।"

প্রভু গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন "মনে করি, মনের অনল চাপা দিয়া রাখিব, কাহাকে মনের কথা জানাইয়া ক্লেশ দিব না, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতে পারি না। স্বরূপ তোমায় আর একটী গান শুনাইতে হইবে। আমি ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিব! তার পরেই তোমাদিগের সঙ্গে শ্রীমন্দিরে যাইব।"

স্বরূপ ব্যগ্রভাবে বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "কোন্ গানটী প্রভু?"

মহাপ্রভু একটুকু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "অই-যে সেদিন গম্ভীরায় গাইয়াছিলে—"নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে" মনে

পড়েছে স্বরূপ? তোমার ভাব-ব্যাকুল কণ্ঠের করুণ-কোমল তানে গানটী নিরতিশয় প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল, এখনও উহার ঝঙ্কার যেন মর্ম্মে লাগিয়া রহিয়াছে। ব্রজ-বিরহিণী যেন চণ্ডীদাসের কণ্ঠে বসিয়া এ মরজগতে বিরহভাব প্রকটন করিয়াছেন। পদটি কি মনোহর।”

স্বরূপ বিনয় নম্রভাবে বলিলেন—“সবদিন সকল গানের ভাব পরিস্ফুট হয় না—উপর হইতে ভাবের তরঙ্গ হৃদয়ে না লাগিলে কোন গানেই রসের স্ফুর্ত্তি হয় না। পদটী মনে আছে।” এই বলিয়া স্বরূপ তান ধরিলেন :—

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আখি ঝোরে, হিয়া পোড়ে, প্রাণ কাঁদে নিতি।
শুইলে সোয়াস্তি নাই, নিদঁ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে প্রাণ ধৈরয না মানে॥
এহি রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে বিধিল মোর কানু-প্রেম-শেল॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস কবি হইল ফাঁপর॥

গান শেষ হইলে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের হাত ধরিয়া বলিলেন, “রামরায় সে দিন গম্ভীরায় এই পদটী যেরূপ শুনা গিয়াছিল, এখানে তাহা অপেক্ষা ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। আমার

১৩

কাণে কেবল ঐ এক ঝঙ্কার লাগিয়া রহিয়াছে "নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে"—রামরায় তুমি দেখেছ কিনা জানি না, কিন্তু সে এক দৃশ্য। পল্লীতে খানা-ডোবায় মাছ থাকে। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপে জল শুকাইতে আরম্ভ হয় তখন উহাদের নিদারুণ যাতনা উপস্থিত হয়। কোন এক কবি বলিয়াছেন, "আকুল সফরী পরাণ" বাস্তবিক এমনই ঘটনা। এই নিদারুণ নিদাঘের ভীষণ দাহের পর যখন প্রবল পলল ধারা স্রোতের আকারে উপর হইতে ডোবায় পতিত হইতে থাকে তাহারই এক নাম—ঢল; অপর নাম "পাউস"। এই ঢল-ধারায় কোন কোন মৎস্য ডাঙ্গায় উঠে। উহারা ঢল দেখিয়া মনে করে সম্মুখে বুঝি জলের অনন্ত প্রবাহ, সেই প্রবাহ পাইয়া উহাদের নিদাঘতপ্ত ক্ষুদ্র ডোবার যাতনা বুঝি তিরোহিত হইবে, এই ভাবিয়া উহারা ঢলের জলে ডাঙ্গায় উঠে! তখন উহারা মৎস-খাদকদের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারায়। হায়, হায় কৃষ্ণপ্রেমের ঢলে পড়িয়া ব্রজবালাদেরও এই দশা হইয়াছিল।"

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি সহসা গাত্রোত্থান করিলেন, পার্ষদগণ সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের আরত্রিক সন্দর্শনে গমন করিলেন।

ব্রজবালার কৃষ্ণ-সাধন।

হেমন্ত কাল। গম্ভীরা মন্দির নীরব। ভক্তগণের অবিরাম প্রবাহ থামিয়া গিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পাইয়াছেন মহাপ্রভু এখন নির্জ্জন স্থানে থাকিতে চাহেন। অন্তরঙ্গ দুই চারিটী ভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও সহিত তিনি অধিকক্ষণ কোনও কথা বলেন না—দিবানিশি কেবলই ব্রজলীলার অনুধ্যান—ব্রজ-রস-আস্বাদন। ব্রজ-ভাব-নিমগ্ন মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ভাবে ভাবে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। পুণ্য-পবিত্রতা ও প্রেমভক্তির সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি-সদৃশ অন্তরঙ্গপার্ষদগণ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-সন্দর্শনই এখন সর্ব্ব সাধনার সার বলিয়া মনে করেন। গম্ভীরা মন্দির দর্শন করিলে মনে হয় যেন এই মরজগতে অনন্ত মাধুরীময় গোলোক-মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে—নরলোকে এমন আনন্দ-বৃন্দাবন-মাধুরী অতি অসম্ভব,—স্বপ্নেরও অগোচর। বদরিকা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি, অযোধ্যা, অবন্তী—এমন কি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-রঙ্গস্থলী শ্রীবৃন্দাবনের অধিবাসী ভক্তগণও গম্ভীরা মন্দিরের এই নবশ্রী দেখিয়া বিস্মিত হন—তাঁহাদের মনে হয় প্রেমের এমন প্রাণময় জাগ্রত মহাতীর্থ আর যেন কখনও তাঁহারা প্রত্যক্ষ কারণ নাই। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখিলে রক্তমাংসময় নর দেহ বলিয়া মনে হয় না—মনে হয় সাক্ষাৎ ঘনীভূত প্রেমানন্দ-রস বিগ্রহ গম্ভীরা-মন্দিরে জীবের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন—কেমন সৌম্য শান্ত সুন্দর সমুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি!

কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে একদিন সায়াহ্নে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালার

পরে স্বরূপ ও রামানন্দ গম্ভীরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রেম-মূর্ত্তির শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু প্রেমহর্ষ ভাবে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন—আমি এই মাত্র তোমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। অন্ধ সহসা নয়নযুগল পাইলে তাহার যেমন আনন্দ—তোমাদিগকে দেখিলেও আমার সেইরূপ আনন্দ হয়—বাস্তবিকই তোমরা আমার অন্ধের নয়ন।"

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন—যিনি দিবানিশি নয়ন মুদিয়া থাকিতেই ভাল বাসেন—তিনি যে নয়নের আদর করেন ইহা কিরূপে বুঝিব ?"

রায় রামানন্দ স্বরূপের কথায় যোগ দিয়া বলিলেন প্রভু এখন অধিকাংশ সময়েই ভাবাবেশে বিভোর থাকেন—আমরা নিকটে থাকিলে সে অনুভব ও আস্বাদনের বাধা হয় বলিয়া প্রাণের বেগে শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াও আড়ালে অপেক্ষা করি।"

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—ইহা তোমাদের অন্যায়—আমাকে যদি তোমরা আপন বলিয়া মনে করিতে, তবে এরূপ ভাবিবার অবকাশ হইত না। আমি সন্ন্যাসী, আমার কেহ নাই—তোমরাও যদি আমাকে এইরূপ পর বলিয়া ভাব, তবে আর কে খবর লইবে ? আমি যখন যে ভাবেই থাকি, তোমাদের কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই।"

মধুময় ভগবান্ এমন মধুর ভাবে এই কয়েকটী কথা বলিলেন যে শুনিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায় যেন একবারে গলিয়া গেলেন। রামরায় বলিলেন, "দয়াময়, এ দীনের প্রতি তোমার এত দয়া !"

মহাপ্রভু রামরায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—রামরায় আপন জনের মুখে শিষ্টাচারের কথা শুনিয়া কেহ কখনও তৃপ্তি পায় না। এখন ও সব কথা ছাড়। আজ সকাল থেকে মনে হইতেছে—তোমাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ কথা শুনিব। সুখময় হেমন্ত ঋতু আসিয়াছে—আর রাসের কথা ঘন ঘন মনে হইতেছে।"

প্রভুর মুখে "হেমন্ত" শব্দ শুনিয়াই স্বরূপ শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন ঃ—

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ-কুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চন-ব্রতম্॥

শ্লোক শুনা মাত্রই মহাপ্রভু সতৃষ্ণভাবে স্বরূপের মুখ পানে কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন—"তার পর, স্বরূপ?

স্বরূপ বলিলেন—"তার পরে যা বলিবার—তাই!

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

মহাপ্রভু হস্তোত্তলন করিয়া বলিলেন একটুকু থাম—আগে বুঝিতে দাও। হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে—নন্দব্রজকুমারিকাগণ হবিষ্য ভোজন করিয়া কাত্যায়নী-অর্চ্চনা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রামরায়, নন্দব্রজকুমারীদের সাধন দেখ, হেমন্তকালে ব্রজধামে অত্যন্ত শীত। কুমারীরা শীতের ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া—রবির উদয় না হইতেই কালিন্দী জলে প্রত্যহ স্নান করিতেন, হবিষ্য ভোজন মাত্র করিয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিতেন। কুমারীরা এই কঠোর ব্রত

করিতেন—কেন করিতেন—তাহা তাঁহাদের প্রার্থনাতেই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদের প্রার্থনা এই;—"মহামায়া মহাশক্তি কাত্যায়নি—ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটিবে ইহা আমরা মনেও স্থান দিতে পারি না, কিন্তু তুমি মা মহাযোগিনী—দুর্ঘট ঘটনে সমর্থা, তোমার নিকটে আমাদের প্রার্থনা, যেন আমরা ব্রজেন্দ্রসুতকে পতিরূপে প্রাপ্ত হই। তুমি অপরাপর শক্তি-সমূহের মধ্যে সর্ব্বোপরি, দেবি কৃপা করিও আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও।"

শ্রীকৃষ্ণানুরক্তা কুসুমকোমলা গোপকুমারীগণ একমাস কাল কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিতেন।

মহাপ্রভু। ভাল, তার পরে কি হইল স্বরূপ?

স্বরূপ। ইহারা প্রত্যূষে উঠিয়া হাত ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণের নাম গাইতে গাইতে কালিন্দী-স্নানে গমন করিতেন। একদিন ঘটনা বড়ই বিপরীত হইল। সে ঘটনায় সরলা গোপবালারা বড়ই বিপদে পড়িলেন।" শ্রীপাদ স্বরূপের কথা শেষ হইতে না হইতেই এসময় রামরায় মুখে হাত দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"বসন-হরণ! কি লজ্জা! রামরায়ের নয়ন-প্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখের হাসি মিলাইয়া গেল—কিন্তু নয়নের হাসি লুকাইল না। মহাপ্রভু ধীরগম্ভীর; প্রথমতঃ কোন কথাই বলিলেন না। চিত্ত নির্ব্বিকার ও প্রশান্ত। স্বরূপ বলিলেন, "সেই বিপরীত ঘটনা বলিতে হইবে কি?"

মহাপ্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কেন বলিবে না, স্বরূপ?

স্বরূপ বলিতে লাগিলেন:—ব্রজবালারা প্রতিদিন যেমন তীরে বস্ত্র রাখিয়া পুণ্যসলিলা কালিন্দীতে স্নান করেন, সে দিনও সেইরূপ কালিন্দী-সলিলে অবগাহন করিলেন। কৃষ্ণনাম তাঁহাদের মুখে লাগিয়াই আছে।"

মহাপ্রভু স্বরূপের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "স্বরূপ, কুমারী-দিগের অনুরাগ দেখ—কুমারীদের হৃদয়ে যে অনুরাগ আমি উহার কণা পাইলেও কৃতার্থ হইতাম। শয়নে স্বপনে কেবলই কৃষ্ণ-ভাবনা, স্নানে-ভোজনে মুখে ঐ কৃষ্ণ-নাম। এমন অনুরাগ না হইলে কি কৃষ্ণ মিলে? বল, তারপর কি হইল।"

স্বরূপ। তার পরে ব্রজবালারা তীরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বসন নাই। এতগুলি বসন কোথা গেল, বাতাস নাই যে উ'ড়ে যাবে? এ ঘাটে কেহ কখনও চোর দেখে নাই—তবে এ বসন চুরি করিল কে? সম্মুখে নীপতরু। চাহিয়া দেখেন নীপশাখায় চিত্রবিচিত্র বসনগুলি ধ্বজার ন্যায় ঝুলিতেছে; আর তাহাদের ঘরের মাখন চোর—তাঁহাদের সেই চিত্তচোর নীপশাখায় বসিয়া পরিহাসের হাসি হাসিতেছেন। আর বুঝিবার বিলম্ব রহিল না, বসন চুরি ইহারই কার্য্য। ব্রজবালারা অপ্রস্তুত হইলেন। অপ্রস্তুত হইবারই কথা। করযোড়ে বসন চাহিলেন—কিন্তু সে কথা কে শোনে? বসন-চোর বড় সহজ ছেলে নয়। রসিকশেখর নীপতরুর শাখায় বসিয়া হুকুম করিলেন, যদি বসন পাইতে চাও হেথায় এস। তোমরা ব্রতচারিণী আমি

কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই—এখনও মিথ্যা বলিব না। বসন নিতে হয় এখানে এস, আমি বসন দিব। বসন থাকিতে কেনই বা এই দারুণ শীতে ক্লেশ পাইতেছ ?”

এই বলিয়া রসরাজ নন্দদুলাল নীরব হইলেন, যেন অতি ভালমানুষ—কিছুই জানেন না—পরম সাধু!

রামরায়। সুধু পরমসাধু—একবারেই পরমসাধু-শিরোমণি! তা না হ’লে কি এত প্রত্যুষে এই বসন-চুরি! শ্রীপাদ, তার পরে কি হইল, বেশী কিছু বলিব না, পাছে প্রভু কি মনে করিবেন ?”

মহাপ্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “এই হুকুমের পরে ব্রজবালারা কি করিলেন, স্বরূপ ?

স্বরূপ। আজ্ঞে, উঁহারা কুমারী হইলেও রসময়ী। বসন-চোরের কার্য্যে ও কথায় উঁহাদের হৃদয়ে প্রেমের পাথার উথলিয়া উঠিল, লজ্জিতভাবে একে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন কিন্তু কালিন্দীর শীতল সলিলে আকণ্ঠমগ্না ব্রজবালাদের অঙ্গযষ্ঠি শীতে থরহরি কাঁপিতে লাগিল। তাঁহারা বিনীতভাবে বলিলেন—“শ্যামসুন্দর যদি আমাদের বসন দাও, আমরা তোমার দাসী হইয়া তোমার আদেশ পালন করিব, আর যদি না দেও, তবে তোমার এই অপরাধের কথা রাজাকে জানাইব।”

রামরায়। রাজার ভয়! সরলা-গোপবালাদের ভয়প্রদর্শনের কথা শুনিয়াও হাসি পায়। যাহার এত দুঃসাহস, সে কি কখনো কাহার ভয় করে ? ইহাতে বসন-চোর কি উত্তর কর্‌লেন ?

স্বরূপ। তাহার উত্তর অতি স্পষ্ট। যদি আমার দাসী হও,

তবে আমার কথা রাখ, এখানে এসে কাপড় লও। নচেৎ দিব না—রাজার ভয়? রাজা আমার কি করবেন?

মহাপ্রভু। একবারেই নিরূপায়! স্বরূপ এইরূপ করিয়াই বুঝি বহিরঙ্গকে আপন করিয়া লইতে হয়? শ্রীভগবান্ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা থাকিতেও কাহাকে আপন করেন না। ভাল, তারপর?

স্বরূপ। তারপর কুমারীগণ নিরূপায় হইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তীরে উঠিলেন—করদ্বারা কোন প্রকারে লজ্জারক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা লজ্জাসঙ্কোচিত দেহে শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। নারীজাতির পক্ষে প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও লজ্জাত্যাগ অধিকতর কঠোর। কিন্তু নিরুপায়।

মহাপ্রভু। বুঝিলাম, তারপর।

স্বরূপ। তারপর ধর্ম্মজ্ঞ-শিরোমণি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমরা ব্রতচারিণী, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র জান না, তোমরা ব্রত লইয়া বিবস্ত্রা হইয়া জলে অবগাহন করায় দেব-অবহেলন হইয়াছে, সেই পাপ-অপনোদনের জন্য আপন আপন মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া নত হইয়া প্রণাম কর। তবে বস্ত্র পাইবে।

রামরায়। অসাধারণ বিড়ম্বনা—এ যে ভারী বিপত্তি!

স্বরূপ। বিপত্তি নয় আ-পত্তি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি। রায়-মহাশয়—"মান, লজ্জা, ভয় তিন থাকিতে নয়"।

রামরায়। কি উৎকট পরীক্ষা। এত পরীক্ষা করিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় শুদ্ধ করিয়া লন। ব্রজবালারা অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিলেন তো?

স্বরূপ। না করিয়া উপায় কি? শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মান-লজ্জা-ভয় প্রভৃতি নারীধর্ম্মে একবারেই তিলাঞ্জলি দিয়া উভয় হাত যোড় করিয়া উঁহারা আপন আপন মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিলেন। তাঁহাদের মুখ-মণ্ডলে লজ্জা বা ভয়ের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না,—সরল প্রাণ! ব্রতভঙ্গ হইলে পাছে বা কৃষ্ণ-প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন তাঁহাদিগকে বস্ত্র দিলেন।

মহাপ্রভু। গোপীজনবল্লভের লীলা-রহস্য তাঁহার একান্ত ভক্তগণেরই অনুভবের বিষয়। এ সকল ব্যাপার—বেদগুহ্য। ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। অধিকারি-ভেদেই ধর্ম্মভেদ। বিশুদ্ধ আনন্দরসের গড়া-তনু ব্রজবালাদের অধিকার ও ভজন-সৌভাগ্য অন্যত্র অসম্ভব।

রামরায়। রসিক-শেখর ব্রজবালাদিগকে বঞ্চনা করিলেন। তাঁহারা তাহা বুঝিলেন না, ব্রজবালাদের ন্যায় অমন সরল মন তো দেখা যায় না!

স্বরূপ। তাতো বটেই। কিন্তু রসরাজ বসন দিবার সময়ে সে কথা নিজেই বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের লজ্জা হরণ করিয়া আবার তাহাদিগকে আরও লজ্জিতা করার জন্য তিনি বলিলেন, "তোমাদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া কেমন ঠকাইয়াছি। এই তোমাদের বুদ্ধি?

রামরায়। ব্রজবালারা ইহাতে কি কোনও উত্তর করিলেন না?

স্বরূপ। কিছুই না, তাঁহারা একটুকু মৃদু হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন। কৃষ্ণের নিকট অপ্রস্তুত হওয়াও তাঁহাদের আনন্দ।

তবে তখন তাঁহাদের নয়নে কিঞ্চিৎ লজ্জার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীমুখকান্তি আরও মধুর দেখাইতেছিল।

রামরায়। তাতো হইবেই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যাঁহার জন্য তাঁহাদের এই কঠোর ব্রতাচারণ, সে ব্রতফল ফলিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

স্বরূপ। তাহা বুঝিয়াও তাঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন, মনের ভাব এই যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে স্পষ্ট বাক্য না শুনিয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিবেন না। তাঁহাদের কথা বুঝি এই ছিল—চতুর চূড়ামণি, রসিকরাজ, আমরা যাহা করিয়াছি, তাহাতে তোমার চরণে অপরাধ হইল কিংবা তোমার প্রীতিসাধন হইল, তাহা জানি না। এখন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে কিনা তাহাই বল, একবার শুনিয়া ঘরে যাই।

রামরায়। ব্রজবালাদের সঙ্কল্প বুঝিয়া সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবান্ কি উত্তর করিলেন?

স্বরূপ। তিনি বলিলেন—"তোমাদের সঙ্কল্প অবশ্যই সত্য হইবে, তোমরা আমায় পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে।

মহাপ্রভু। স্বরূপ, এস্থলে শ্রীভাগবতের দুইটী কথা না বলিলে তোমার এ প্রসঙ্গ অসম্পুর্ণ থাকিবে। উহার একটি কথা এই শ্রীভগবান্ গোপবালাদিগকে বলিয়াছিলেন—যাহাদের বুদ্ধি কেবল আমাতে আবিষ্ট হইয়াছে, যাহাদের অন্য কোন কামনাই নাই—তাহাদের কাম—সাধারণ কাম নয়, এবং তাদৃশ কামে কামজনিত কর্ম্মবন্ধনও ঘটে না! কেন না ভ্রষ্ট যবের আর অঙ্কুর হয় না,

তাহার উপরে সেই ভ্রষ্ট যব যদি ভর্জ্জিত হয়, তবে কোনও ক্রমে তাহার আর অঙ্কুরের সম্ভাবনা থাকে না। ব্রজবালাগণের কামনান্তর রহিত এবং ভাববিশেষ সংস্কৃত ভগবৎপ্রেম-সেবারূপ কাম—কোনও ক্রমেই কর্ম্মবন্ধনের হেতু নয়। যদিও ব্রজবালাগণ শ্যামসুন্দরের শ্রীমুখে এই উপদেশ প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করেন নাই, তথাপি পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ এস্থলে এই উপদেশ প্রকটন করিয়া ভালই করিয়াছেন। তাঁহারা যে কথার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, স্পষ্টতঃই প্রেমময় তাঁহাদিগকে সে কথাও শুনাইয়া দিয়াছিলেন— "হে সতী কুমারীগণ, তোমাদের কাত্যায়নী-ব্রতসাধনাসিদ্ধি হইয়াছে, এখন গৃহে যাও, আগামী রজনীসমূহে তোমরা আমার সঙ্গলাভ করিতে পারিবে।"

রামরায়, বাস্তবিকই রসিকশেখর পরম করুণ আনন্দলীলা-রসময় বিগ্রহের এ করুণা না থাকিলে ভজনসাধন একবারেই নিষ্ফল হইত। আর ব্রজবালাদের সাধন—একবারেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ। এই সাধনার মহাফল—মহারাসে সম্মিলন।

শ্রীশ্রীমহারাস

কার্ত্তিকের শুক্ল পূর্ণিমায় কতিপয় অন্তরঙ্গ পার্ষদসহ মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-বাগানে গমন করিলেন। গুণ্ডিচা বাগানের বনমাধুরী স্বভাবতঃই শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতি জাগ্রত করে। বহুদুরব্যাপী অশ্রেণীবদ্ধ চিরশ্যামল বৃক্ষবল্লরী স্বাভাবিক সজীবতায় কোমল সৌন্দর্য্যে সুবিশাল গুণ্ডিচা-বাগানের নিত্যসম্পদ্‌রূপে বিরাজমান। কে কবে এই উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহা স্বাভাবিক বনের আকার ধারণ করিয়াছে। স্বভাবজাত অযত্নপরিবর্দ্ধিত পাদপাবলী, নিবীড় শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া যেন গগনস্পর্শ করিতে আস্পর্দ্ধা করিতেছে। গুবাক খর্জ্জুর তাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ কোনও সময়ে যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপিত হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পলাশ পিয়াল অম্র ও পনস বৃক্ষগুলি একবারেই অশ্রেণীবদ্ধ। পর্কটী কোবিদার ও অশ্বত্থ বৃক্ষগুলি অতি প্রাচীন। অধিকাংশ স্থলেই নিবীড় লতাবিতানে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলীর মূলদেশ লতাগৃহের শোভা পাইতেছে। সপ্তপর্ণী বৃক্ষগুলি আপন গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত। এতদ্ব্যতীত জম্বু অর্ক বিল্ব বকুল কদম্ব নীপ নিম্ব প্রভৃতি বহুল বৃক্ষে নীলাচলের এই চির-হরিৎ ক্ষেত্র সর্ব্বদাই ভক্তহৃদয়ে ব্রজবন-মাধুরীর উদ্দীপনা আনিয়া দেয়। কুসুমপাদপ ও কুসুমবল্লরীর প্রাচুর্য্যে এই বনশোভা শতগুণে সম্বর্দ্ধিত। কোথাও নবকিশলয়দলে, কোথাও সুগন্ধিমঞ্জরী রাশিতে কোথাও বা কোমল

কুট্মলে কোথাও প্রফুল্ল কুসুমে বৃক্ষবল্লরী শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে তুলসী-কানন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতাবেশে গুণ্ডিচা, বাগানের শ্যামল সম্পত্তির স্নিগ্ধ কোমল পবিত্রভাব জাগাইয়া তুলে। বৃক্ষ-বাটিকাগুলি চিরগৌরবময় ভারতীয় ঋষিগণের পুণ্যাশ্রমেরই প্রতিরূপ।

মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে লইয়া এই বাগানের অভ্যন্তরে নিভৃত স্থলে একটী বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। ইহার চারি দিকেই তুলসী কানন ও নানাবিধ ছোট বড় ফলের গাছ। গৃহের সংলগ্ন দক্ষিণভাগে কতকগুলি বকুল তমাল ও ছাতিম বৃক্ষ। পূর্ব্ব ভাগ অপেক্ষাকৃত অনাবৃত, গৃহখানি পূর্ব্বমুখ।

মহাপ্রভু, বাঁধা বকুলতলায় উপবেশন করিয়া শ্রীল রামরায়কে বলিলেন—রামরায়, মনের সাধ, তোমাদের মুখে রাসলীলা শ্রবণ করি, কিন্তু আমি কি রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী ? বহু তপস্যার ফলে রাসলীলা-শ্রবণে অধিকার জন্মে। তপস্যা তো কতই আছে ? সকল তপস্যাতে তো রাসলীলা অনুভবের অধিকার ঘটে না। শ্রীভগবানের প্রেম-রসময়ী উপাসনায় চিত্ত সুনির্ম্মল, সুপ্রসন্ন, পরমকোমল ও পরমোজ্জ্বল না হওয়া পর্য্যন্ত রাসলীলা-শ্রবণ-বাসনা বিড়ম্বনা-জনক বলিয়াই মনে হয়। আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী, আমার ইহাতে অধিকার নাই, ইহা জানিয়াও রাস-লীলা শ্রবণে লোভ হয়। কামনার তো অগম্য স্থান নাই। আমি কি সে অধিকার লাভ করিতে পারিব ?”

রামরায়। প্রভু, দাসের গৌরব কি এমন করিয়াই বাড়াইতে হয়। এ অধম বিষয়ী শ্রীচরণের অযোগ্য ভৃত্য। ইহার নিকট

স্বরূপ গোপন—কেবল বঞ্চনা মাত্র। অথবা আপনার এ দীনতা ও অধিকারের কথা তোলা কেবল লোক-শিক্ষার ভাণ মাত্র।

মহাপ্রভু। স্বরূপ, ব্রজবালাদিগেব সঙ্গবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য প্রেমময় শ্যামসুন্দর কুসুমিত কুঞ্জবনে যে রসময়ী লীলা প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা কি মনোহর মহামিলন—কি আনন্দের বন্যা তরঙ্গ! এ আনন্দে নৃত্য না করিয়া কেহ কি কখন স্থির থাকিতে পারে, স্বরূপ? নৃত্যময়ী রাসলীলা-প্রেমের মহামহোৎসব—আনন্দের অগাধ অনন্ত বারিধির দিগন্তপ্রসারী উত্তাল তরঙ্গ! সে আনন্দের বর্ণনা হয় না—হইতেই পারে না। তুমি ও রামানন্দ আমায় এ আনন্দের কণালেশেরও আস্বাদনের উপায় করিয়া দাও। আমি চিরদিনই তোমাদের নিকট ঋণী।"

রামানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "কি বলিতে হইবে নিজে কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া বলিয়া দিন। যন্ত্রীর কাছে যন্ত্র বাজিবে, ইহাতে আর কাহার ভয়?

মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যাহা উঠে, তাহাই উচ্চারি॥

মহাপ্রভু। ব্রজবালাকুল বাঁশীর ডাকে বিহ্বল হইয়া শ্যামদর্শনে বনে আসিয়াছিলেন, কি বল, রামরায়।

রামরায়। হাঁ প্রভু। বাঁশরীই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দূতী। শ্যামসুন্দরের বাঁশরী রবে কেহ কখন কি স্থির থাকিতে পারে? পাষাণ দ্রব হয়, যমুনা উজান বয়, তরুলতায় পুলক প্রকাশ পায়, বনের পশু পাখী পর্য্যন্ত শ্যামের চরণের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়, আকাশের

চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ নক্ষত্রগণের গতি স্তম্ভিত হয়, সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড সেই মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত হয়।

মহাপ্রভু। ইহাতে ব্রজবালাদের ধৈর্য্য থাকিবে আর কি করিয়া ?

রামরায়। হাঁ প্রভু, যখন এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেহই সে শব্দ শুনিতে পায় না, তখনও তাঁহারা সে ধ্বনি শুনিয়া অধীর হয়েন। তাঁহারা কুলবালা, স্থির ভাবে ঘরে থাকাই তাঁহাদের ব্রত। কিন্তু বংশীরবে সে ব্রত পালন করা অসম্ভব।"

যখন মহাপ্রভু ও রামরায় এইরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন, আমি-আত্মারাম তখন লতাকুঞ্জের আড়ালে চোরের ন্যায় দাঁড়াইয়া উহা শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে কয়েকটা নিতান্ত নূতন গান আমার মনে পড়িল। আমি গুন্ গুন্ রবে গান ধরিলাম—

ওগো শোন কে বাজায়।
বনফুলের মধুগন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশীখানি চুরি করে হাসিখানি
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোন কে বাজায়।
কুঞ্জ বনের ভ্রমর বুঝি বাঁশীর মাঝে গুঞ্জরে।
বকুল কলি আকুল হয়ে বাঁশীর গানে মুঞ্জরে॥
যমুনারি কলতান কানে আসে কাঁদে প্রাণ
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়
ওগো শোন কে বাজায়।

মনে করিয়াছিলাম আমার গানটী শুনিতে পাইলে স্বরূপ ঠাকুর হয়ত আমাকে ডাকিয়া নিকটে লইবেন। কিছুই নয়—কাহারও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আবার মনে করিলাম এটি বুঝি ওঁদের মনের মত নয়—তাই আর একটি বাঁশীর গান গাইলাম ;—

বাজিল কাহার বাঁশী মধুর স্বরে।
আমার নিভৃত নবজীবন পরে॥
প্রভাত কমল সম ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে।
ভেসে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী।
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পুরি॥
কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ
পরাণের আবরণ মোচন করে।
বাজিল কাহার বাঁশী মধুর স্বরে॥
লাগে বুকে সুখে দুঃখে কত যে ব্যথা।
কেমনে বুঝাবে কত না জানি কথা॥
আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে রাজি
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা-ভরে।
বাজিল কাহার বাঁশী মধুর স্বরে॥

গান গাহিয়া নীরব হইলাম। এবারও কোন সাড়া পাইলাম না—লতাকুঞ্জের অন্তরালে যে কোন প্রাণী আছেন, তাহারও পরিচয় পাইলাম না। যে মধুর আলাপন শুনিতেছিলাম, তাঁহার কণালেশও আমার কর্ণে পৌঁছিল না। মনে হইল উঁহারা বুঝি আমার এই

১৪

গীতি-রসেই নিমগ্ন। মনের উৎসাহে আরও একটি গান গাইলাম--

মরি লো মরি
আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাব না।
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী বল কি করি ?
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে,
সাজের বেলা বাজে বাঁশী ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস যদি পথ বলে দে,
আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে ?
দেখি গো তার মুখের হাসি
(তারে) ফুলের মালা পড়িয়ে আসি
(তারে) বলে আসি তোমার বাঁশী
(আমার) প্রাণে বেজেছে ॥

কই—একবারেই নীরব। আমায় তো কেহ ডাকিলেন না। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল—আমার এ গান নিশ্চয়ই ও রাজ্যের ভাষায় রচিত নয়—এ ভাব বুঝি সে রাজ্যে পৌছিবার উপযুক্ত নয়। তাই আমি এ বাঁশীর গান আমার প্রাণের দেবতাকে শুনাইতে পারিলাম না। কিন্তু হায়, এ কি করিলাম—বাঁশীর গান করিতে যাইয়া এমন অমৃতময়ী রাসের কথা শুনিলাম না—মনে বড় অনুতাপ হইল। উকি দিয়া চাহিয়া দেখি, কোথাও কেহ নাই। কি অপরাধ ! আবার স্থিরভাবে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নিজের অপরাধের

ক্ষমার জন্য একান্তচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে নিমীলিত নেত্র-প্রান্তে কনককান্তি শ্রীগৌর-শশীর মধুর কিরণ প্রকাশ পাইল,—চাহিয়া দেখি সকলেই বিরাজমান, পূর্ব্ববৎ কথা চলিতেছে। স্বরূপ ঠাকুর চণ্ডীদাসের কৃত বাঁশী-মাহাত্ম্য সূচক গান করিতেছেন :—

শ্যামের বাঁশরী দু'পুরে ডাকাতি
সরবস হরি নিল।
হিয়া দগদগি পরাণ পাগলী
কেন বা এমতি কৈল॥
এমতি যে ভাব না বুঝি তাহার
পিরীতি তাহার সনে।
গোপত করিয়া কেন না রাখিল
বেকত করিল কেনে॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম-মরম-ফাঁসি।
চণ্ডীদাস ভণে এই সে কারণে
কানু-সরবস বাঁশী॥

শ্রীপাদ স্বরূপের মধুর গানে মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

কপালে স্বেদবিন্দু—শ্রীমুখমণ্ডল হর্ষ প্রফুল্ল—রামরায় সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীপাদ স্বরূপকে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"ঐ দেখুন, প্রভু নেত্র-যুগল উন্মীলন করিয়াছেন, কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নাই—একটুকু সূক্ষ্মভাবে দেখুন, প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডলে কিলকিঞ্চিত ভাবরাশি ক্ষণে ক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আমার বোধ হয়—প্রভু রাস-রসাস্বাদনে একবারেই বিহ্বল। আহা, এ রস তো ভাষায় ফুটিবার নয়, কেবলই আস্বাদনের বিষয়—আর সে আস্বাদন ঠিক মূকাস্বাদনবৎ! আনন্দের মহাসাগরের চারিদিক হইতে আনন্দ-তটিনীগণ কুলুকুলু-কলকলনাদে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া মহা আনন্দ-নর্ত্তনে মিলিত হইয়াছেন—আর সকলেই মনে করিতেছেন মহাসাগর আমারই। প্রভু রাসলীলার এই সুধা রসাস্বাদনে বিভোর। শ্রীপাদ, প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডলের এমন হর্ষোৎফুল্লভাব আর তো কখনও দেখি নাই। কি উজ্জ্বল—কি মধুর—কি পরমানন্দময়!

স্বরূপ। মনে করিয়াছিলাম, রাসমিলনের একটা গান করিব। কিন্তু বৃথা। প্রভুর শ্রীমুখের ভাব দেখিয়া গানের ভাষা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। প্রভু এখন স্বানুভাবানন্দে মগ্ন। আমাদেরই বা কম আনন্দ কিসে? আমরা উহার শ্রীমুখমণ্ডলেই রাস-রস-সন্দর্শন করার সুবিধা পাইয়াছি। যতক্ষণ এ সৌভাগ্য থাকে ততক্ষণ উহাই প্রত্যক্ষ করি।"

এই বলিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামরায় মহাযোগীর ধ্যানের ন্যায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখলণ্ডলের অনন্ত আনন্দের ভাবচ্ছবি দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত

হইল। রজনী প্রায় অবসান হইল—অতি ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "স্বরূপ, আমায় তোমরা এ কোথা আনিয়াছ, এমন ভরপুর আনন্দ হইতেও কি জাগাইয়া তুলিতে হয়?—কি সৌন্দর্য্যময়, কি মাধুর্য্যময়, কি আনন্দময়—এই রাস-সম্মিলন ও রাসনর্ত্তন! অসংখ্য আনন্দমূর্ত্তি—অনন্ত দিক হইতে আসিয়া শ্যামসুন্দরকে একবারে ঘেরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু শ্যামের আবার এমনই প্রভাব, তিনিও অনন্ত হইয়া দাঁড়াইলেন, যত গোপী, তত শ্যাম! প্রত্যেক ব্রজবালা আপন আপন পার্শ্বে শ্যামসুন্দরকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, আনন্দের বন্যাতরঙ্গে রাসনৃত্য আরম্ভ হইল, যেন নব মেঘে সৌদামিনী—কি মধুর, কি সুন্দর, কি মনোহর—একি বলিবার কথা—একি বলা"—বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর ভাষা গদ্‌গদ্ হইয়া উঠিল। তিনি সহসা প্রমত্তভাবে দাঁড়াইলেন, একহাতে একদিকে শ্রীপাদ স্বরূপকে অপর হাতে অপর দিকে শ্রীল রামরায়কে টানিয়া আনিয়া মধ্যে দাঁড়াইলেন। দুই পার্শ্বে দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদকে লইয়া মহাপ্রভু আনন্দোচ্ছ্বাসে "জয়-জয় গোপীজনবল্লভ" বলিয়া বিবিধ নৃত্য-কলায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে আমি বিবশ হইয়া বৃক্ষমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম—চেতনা পাইয়া দেখি, কোথাও কিছু নাই; সকলেই অন্তর্ধান করিয়াছেন—ধীরে ধীরে গম্ভীরায় ফিরিলাম। দেখিলাম—প্রভু গম্ভীরার মধ্যে বসিয়া বিরহ-ব্যাকুল অবস্থায় রোদন করিতেছেন, নিকটে শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামরায়।

মাথুর-বিরহ*

দিন চলিয়া যায়—সুখ-দুঃখের স্মৃতি রাখিয়া পক্ষ—মাস—বৎসর—চলিয়া যায়, উহাদের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখদুঃখের স্মৃতিও ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়। কিন্তু কোন কোন স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না—উহা রাবণের চিতার মত দিবানিশি জ্বলিতে থাকে—উহা স্থায়ী ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া উঠে। সুখ-দুঃখের অনন্ত সঞ্চারী ভাবের ছোট বড় তরঙ্গ এই ভাবের উপরে আইসে এবং চলিয়া যায়,—কিন্তু স্থায়ী ভাব নিত্য ও শাশ্বত।

শ্রীগৌরলীলায় বিপ্রলম্ভ-রসই স্থায়ী রস—এই লীলার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবলই শ্রীভগবদ্-বিরহের তীব্র বেদনা। রাস-রসের আনন্দাস্বাদন স্বপ্নের ন্যায় তিরোহিত হইল—স্থায়ীভাব শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ তখনই প্রভুর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মাঘ মাস উপস্থিত। প্রেমিক ভক্তগণের চিত্তে মাঘের স্মৃতি চির-বিষাদময়ী। এই মাঘ মাসেই শ্রীনবদ্বীপ-শশী নবদ্বীপ আঁধার করিয়া ঘরের বাহির হয়েন। এই মাঘ মাসেই নাকি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রজবাসিগণকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া মথুরায় গমন করেন। মাঘ মাস আসিলেই প্রভুর হৃদয়ে ব্রজ-বিরহ-যাতনা শতগুণে বাড়িয়া উঠে।

সেই মাঘ মাস আসিল। প্রভুর হৃদয়ে বিরহের আগুন এক-

* গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বারে প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। দিবানিশি কেবলই হাহাকার—কেবলই দীর্ঘশ্বাস—আর বর্ষার ধারার ন্যায় নিরন্তর অশ্রুধারা! প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে—ঘোরতর বিষাদে বিষাদে শ্রীঅঙ্গ অবশ ও বিশীর্ণ,—অনাহার অনিদ্রা! অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত নাই। প্রভুর শ্রীমূর্ত্তিদর্শন মাত্রেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কোমল প্রাণ ব্যক্তিগণের অধিক কাল সে দৃশ্য দর্শন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীগোবিন্দদাসের প্রাণ ওষ্ঠাগত, বহু চেষ্টা করিয়াও প্রভুর শ্রীমুখে এক বিন্দু জল দিতে পারেন না। মর্ম্মী সাথী শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীল রামরায় গানেও শ্রীকৃষ্ণ-কথায়, কখন কখন তাঁহার বিরহ-মূর্চ্ছা-প্রশমনে সমর্থ হয়েন, কখনও বা একবারেই অসমর্থ।

সমবেদনার কথা শুনিতে পাইলে চিত্তের ভাব সময়ে সময়ে লাঘব হয়, তাই শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামরায় ব্রজ-বিরহের গান ও কথা তুলিলে মহাপ্রভু তাহা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন এবং ইঁহাদের সহিত দুই একটি বাক্যালাপ করেন।

বসন্ত পঞ্চমীর সন্ধ্যা। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, স্বরূপ রামরায় এবং আরও দুই চারিটী মর্ম্মীভক্ত মহাপ্রভুকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। মহাপ্রভু শ্রীপাদ স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়া আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন, "প্রাণের সখা—তোমরাই চিরদিন আমার একমাত্র ভরসা। শ্রীবৃন্দাবন-রস-সুধা ভিন্ন এ জীর্ণ হৃদয়ের নিদারুণ পিপসার আর কিছুতেই শান্তি নাই।"

প্রভুর কথা শেষ হইতে না হইতেই ভাব বুঝিয়া শ্রীপাদ স্বরূপের কণ্ঠ আকুল তানে বাজিয়া উঠিল—

না হ'তে দরশ সুখ বিধি কৈল বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন করিতে চিতে বিধি কৈল আন।
অব নাহি নিকশয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত করল হিয়া মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুষ নাহ॥
নিশি দিন আন ছান করয়ে পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥

মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—"স্বরূপ এ গান আমার প্রাণের গান—আমারই ভাবের প্রতিধ্বনি—কি মর্ম্মস্পর্শী!

স্বরূপ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তবে এ ভাবের আরও একটি পদ শুনুন :—

প্রেমক অঙ্কুর আত জাত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উয়ল যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈগেল নৈরাশা॥
ওগো মাই, অব মুঝে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছরাই।

কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভাবি কানু চরিত অনুমানিয়ে
বিঘটন বিহি নিরমাণ॥
পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দ দাস রসপুর॥

মহাপ্রভু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—হায় এত প্রিয়তমের এমন শঠতা। তিনি "অবধি" করিয়া গেলেন—অর্থাৎ কল্য ফিরিয়া আসিব", এই আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না, কি নিদারুণ নিঠুরতা।"

রামরায় আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "শ্রীপাদ স্বরূপ সেদিন বকুল তলায় এই ভাবের একটি অতি মনোহর পদ গাইয়াছিলেন।" মহাপ্রভু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "স্বরূপ সেই পদটী গাও।"

স্বরূপ একটুকু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ওরূপ পদ আরও দুইটী আমার জানা আছে, গাইতেছি :—

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥

যোয়ারের পাণি নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঁয়ানু
বন্ধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি জানিয়া আসহ
বন্ধুয়া আসে না আসে।
"নিঠুরের পাশে আমি যাই চলি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

মহাপ্রভু। ইহাই গোপী-ভজন মাধুরী! নব যৌবনের ভরপুর অনুরাগ ছাড়া রসময় চির-সুন্দরের ভজন হয় না—চণ্ডীদাস অতি স্পষ্ট, সরস ও সরল ভাষায় তাহা খুলিয়া বলিয়াছেন। তার পর?

স্বরূপ। আরও একটি পদ আছে, সে পদটীর কর্ত্তাও শ্রীবৃন্দাবন-রস-মাধুর্য্যের অমর কবি—চণ্ডীদাস। এই শুনুন:—

সখিরে,

বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল
ফুটল মাধবী লতা
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জরে ভ্রমরী যথা॥

আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন পরশ রতন ধন
কাচের সমান ভেল॥
কোন সে নগরে নাগর রহল
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন গুণবতী গুণেতে বেঁধেছে
লুবধ ভ্রমর মোর॥
যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস হেথা॥

স্বরূপের গান শেষ হইতে না হইতেই ভাববিহ্বল মহাপ্রভুর নয়ন হইতে ঝরঝর অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন—রামরায় যদি যৌবনের পূর্ণ অনুরাগ শ্যামসুন্দরের সেবায় সমর্পিত না হয়, তবে সে যৌবন বৃথা বই আর কি? নব যৌবনের পূর্ণরাগে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—রসময় শ্যাম সুন্দরের ভজনই গোপী-ভজন; অতি সুন্দর!—পদকর্ত্তারা প্রত্যক্ষ লীলাদর্শী, ভাবসাগরের মর্ম্মতলদর্শী। তার পর, স্বরূপ?"

মহাপ্রভুর লীলাগান-শ্রবণ-পিপাসার যেমন কিছুতেই তৃপ্তি নাই—শ্রীপাদ স্বরূপের লীলা-রসাত্মক পদ-ভাণ্ডারও তেমনই অফুরন্ত। স্বরূপ ভাব বুঝিয়া আবার গাইলেন:—

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঁয়ায়বু
কি করব সো পিয়া-লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে থাকি কণ্ঠ শুকায়ল
কো দূর করব পিয়াসা।
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি॥
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কিয়ে মোর করম অভাগী॥
শ্রাবণ মাস যব বিন্দু না বরিখব
সুরুতরু ঝাঁঝ কি ছন্দে।
গিরিবর সেবি ঠাম না পায়ব
বিদ্যাপতি রহ ধন্দে॥

শ্রীপাদ স্বরূপ অশ্রুজলে গান শেষ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"আমার দশাও তাই। এমন রসময় প্রেম সরোবরের নিকটে থাকিয়াও ব্রজ-রসে বঞ্চিত হইলাম—হৃদয় যে মরু—সেই মরু।"

এই বলিয়া স্বরূপ কাঁদিতে লাগিলেন, নয়ন জলে তাঁহার শ্রীমুখ-কমল পরিপ্লুত হইয়া গেল। মহাপ্রভু নিজের হাতে তাঁহার ও শ্রীরাম রায়ের নয়ন জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"কোথায় তোমরা আমায় সান্ত্বনা দিবে, আর তোমরাও যদি এইরূপ আকুল হও, তবে

আমার উপায় কি ? স্বরূপ, আমার আরও একটি গান মনে পড়িতেছে,—সে গানটীতে শ্রীমতীর মধুময়ী পূর্ব্ব স্মৃতি বিজড়িত।”

মহাপ্রভুর কথা শেষ হইতে না হইতেই স্বরূপ বলিলেন—বুঝিয়াছি—“এই না মাধবীতলে” এই পদটী তো ?”

এই বলিয়া স্বরূপ ধানশী রাগিণীতে গান ধরিলেন ঃ—

এই তো মাধবী তলে   আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সতত ধেয়ায়।
পিয়া বিনা হিয়া মোর   ফাটিয়া না যায় গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।
আমারে লইয়া সঙ্গে   কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিছুরই বনে।
নব কিশলয় দলে   শেজ বিছায়ই
রস-পরিপাটির কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে,   শয়নে স্বপনে পিয়া
যামিনী জাগিয়া পোহাই।
সে হেন গুণের পিয়া   কোথা বা রহল গিয়া
কার সনে রজনী গোঁয়াই॥
এতেক দিবস হৈল,   প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না পাই সংবাদ।
গোবিন্দ দাস চলুঁ   শ্যাম বুঝাইতে
দারুণ বিরহ-বিষাদ॥

শ্রীপাদ স্বরূপ আকুল কণ্ঠে আখর দিয়া এমনভাবে এই গানটী গাইয়াছিলেন যে এত বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, আমার কাণে এখনও সে ঝঙ্কার নূতনের মত লাগিয়া রহিয়াছে। আমি পর্য্যন্ত এ গানটী শুনিয়া অধীর হইয়াছিলাম। মহাপ্রভু অনেক ক্ষণ আনমনার মত থাকিয়া বলিলেন, "স্বরূপ পিপাসার তো তৃপ্তি হইল না,—তার পর?"

স্বরূপ। প্রভু, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে দিন দিন একবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সখীদের প্রবোধ বাক্যে আর তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার কথা গানেই বলিতেছি ঃ—

সজনি কো কহে আয়ব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পারকিয়ে পায়ব
মঝুমনে নাহি পাতিয়াই॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরষ গোঙায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা॥
বরষ বরষ করি সময় গোঙায়নু
খোয়াইনু এ তনু আশে।
হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধব মাসে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী
অব নাহি হোত নিরাশ।

সো ব্রজনন্দন হৃদয়-আনন্দন
ঝটিতি মিলব তব পাশে ॥

মহাপ্রভু অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"রামরায়, শ্রীকৃষ্ণই গোপীর জীবন, কৃষ্ণবিহনে এক মুহূর্ত্তও তাঁহারা জীবন ধারণ করিতে পারেন না। জলছাড়া মৎস্য, সমীরণ-হীন স্থানে সাধারণ জীব,—যেমন ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ-ছাড়া গোপীদের জীবনও সেইরূপ। শ্রীমতী রাধা তো একবারেই কৃষ্ণময়-জীবিতা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কণ্ঠের শ্বাস—শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন। সিন্ধু ছাড়িয়া উহার বিন্দু ডাঙ্গায় পতিত হইলে তখনই শুকাইয়া মরে। ব্রজের প্রেম-জীবন ঠিক এইরূপ।"

রামরায় সজল নয়নে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—হাঁ প্রভু! শ্রীপাদের গানে আমার প্রাণেই যখর সেই বিরহ-বেদনা অনুভব হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর যাতনা যে কত গুরুতর, তাহা অনুভবে আনাও অসম্ভব।"

মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ তোমার গানে স্পষ্টতঃই মাথুর-বিরহ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া এখানে উপস্থিত। ইহাতে শ্রীমতীর হৃদয়ে যে কত যাতনা, তাহা বাস্তবিকই আমরা অনুভবে আনিতে পারি না। শ্রীমতীর অধীরতা অত্যন্ত অসহনীয়, শুনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—অথচ না শুনিয়াও স্থির থাকিতে পারি না। তার পর?

স্বরূপ। তার পর শ্রীমতীর অধীরতা ও ব্যাকুলতাপূর্ণ আর একটি পদ শুনুন :—

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ
যদি মোর পিয়া নাহি এল।
এ নব যৌবন পরশ রতন
কাচের সমান ভেল ॥
অঙ্গেতে ভসম গেরুয়া বসন
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি ॥
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
কার ঘরে যদি মিলে গুণ-নিধি
বাঁধিব বসন দিয়ে ॥

মহাপ্রভু। রামরায়, শ্রীমতীর জোড় দেখ। শ্রীরাধা-অনুরাগের এমনই মহিমা যে শ্রীকৃষ্ণ যে বহুবল্লভ, সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই অমনি বসন দিয়া বাঁধিয়া ফেলিবেন। মা যশোদা একদিন বহু সাধনায় সেই নিখিল বিশ্বাধারকে বাৎসল্য-প্রেম-দামে বন্ধন করিয়াছিলেন, আজ শ্রীমতী তাঁহাকে আপন অঞ্চল দিয়া বাঁধিয়া আনিতে চলিলেন।

স্বরূপ। "আপন বঁধুয়া বাঁধিয়া আনিব
কে তারে রাখিতে পারে।
যদি কেউ রাখে ত্যজিব জীবন
নারী বধ দিব তারে ॥

চণ্ডীদাসের বচন-মাধুরী

"শুন বিনোদিনী-রাধা।
যোগিনী হইতে ভয় পাই চিতে
দারুণ কুলের বাধা॥"

মহাপ্রভু। আঃ কি যাতনা! কি মর্ম্মস্পর্শী—এই শ্রীরাধা-অনুরাগের পদ! কি নিদারুণ বিরহ! এই বিরহেও কি জীবন-ধারণ করা যায়? তার পর স্বরূপ?

স্বরূপ। তার পর শ্রীমতী প্রাণ-ত্যাগের জন্যই প্রস্তুত হইয়া বলিলেন:—

শীতল তছু অঙ্গ বলি পরশ রস-লালসে
করল কুলধরম গুণ নাশে।
সো যদি সখি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি
মরিলে করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
রাখবি দেহ বরজকি মাঝে॥
হামারি দুনো বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে।
ললাট হৃদি বাহু মূলে শ্যাম নাম লেখবি
তুলসী-দাম দেয়বি মঝু গলে॥

১৫

ললিতা লহ কঙ্কণ বিশখা লহ অঙ্গুরী

চিত্রা লহ—

স্বরূপের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। মহাপ্রভু অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া স্বরূপের নয়নজল মুছাইয়া তাঁহাকে নিজের কোলের সম্মুখে টানিয়া লইলেন। রামরায় মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্বরূপ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "শেষ হয় নাই প্রভু, আর দুই একটি গান গাইব।" স্বরূপের কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়; তিনি গাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গান ফুটিল না। কণ্ঠ যেন স্তম্ভিত, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া গানের তান আসিতেছে; স্বরূপের বক্ষে প্রবল চাপ। করুণাময় মহাপ্রভু স্বরূপের বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিলেন; স্বরূপ আবার গান ধরিলেন :—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা যতেক সখী থেকে মঝু সঙ্গে॥
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখ মোর অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে॥
সেই সে তমাল-তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অচেতন তনু মোর তাহে যেন রয়॥

কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়াদরশনে॥
পুন যদি চাঁদমুখ দরশ না পাব।
বিরহ অনলে মাহ তনু তেয়াগিব॥

এই গানের প্রারম্ভেই মহাপ্রভুর নয়ন উত্তান হইয়া উঠিল, নয়নতারা স্থির হইয়া গেল। রামরায় ভাব বুঝিয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া বসিলেন, তিনি অর্দ্ধেক গান শুনিতে না শুনিতেই কাঁপিতে কাঁপিতে রাম রায়ের কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্বরূপ নিজের হৃদয়ের ভাবে চাপা দিয়া গান ধরিলেন—

কহিতে কহিতে ধনী মুরছিত ভেল।
ধাই বিশখা তারে কোলে করি নিল॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস।
নাসাগ্রেতে তুল ধরি দেখয়ে নিশ্বাস।
শ্রবণে বদন দেই কহে কৃষ্ণনাম।
চেতন পাইয়া কহে কাহা ঘনশ্যাম॥
সম্মুখে তমাল হেরি করে নিরীক্ষণ।
উন্মাদিনী হয়ে যায় দিতে আলিঙ্গন॥
ঐছন ধনীর দশা করি নিরীক্ষণ।
গোবিন্দদাস ভেল সজল নয়ন॥

স্বরূপের নয়ন শুষ্ক,—দৃষ্টি উদাস—যেন আত্মহারা ও উন্মত্ত। স্বরূপ গান ছাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ-

কাল পরে, মহাপ্রভুর অর্দ্ধবাহ্য দশার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল প্রফুল্ল।

রামরায় স্বরূপকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"শ্রীপাদ, প্রভুর বদনকান্তি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন বিরহবিধুরা শ্রীরাধার দূতী শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের সংবাদ আনিয়াছেন।"

স্বরূপ হর্ষ-প্রফুল্লিত চিত্তে বলিলেন, "আমারও যেন তাই বোধ হইতেছে।" এই বলিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে গান ধরিলেন।

স্বরূপের গান শুনিয়া মহাপ্রভু নয়ন মেলিলেন, কিন্তু তাঁহার চাহনি দেখিয়া বুঝা গেল, তিনি এখনও সম্পূর্ণ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হন নাই। নয়নযুগল সরস, সহর্ষ, শতদলতুল্য প্রফুল্ল। অতি ক্ষীণ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মৃদু কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—ললিতে, "একবার এগিয়ে দেখ বন্ধু আর কতদূরে।"

এই বলিয়া যেন আনন্দ-আশায় একটু মৃদু হাসিয়া আবার নয়ন নিমীলন করিলেন। হাসিটুকু যেন সেই কোমল মসৃণ বিম্বাধরে লাগিয়া রহিল। স্বরূপ ও রামানন্দ এই আধঘুমন্ত মধুরোজ্জ্বল হর্ষপ্রফুল্ল শ্রীমুখকমল-সন্দর্শন-সুধায় বিভোর হইলেন।

মধুর মিলন।

বিরহের মাঘ অস্ত হইল, এখন মিলনের বসন্ত। গম্ভীরা উদ্যানে শুষ্কতরু মঞ্জুরিল, বসন্তের ফুল ফুটিল, অলিকুল গুণ গুণ শব্দে কুসুম-কানন মুখরিত করিয়া তুলিল, পিকবধূর উন্মত্ত রোলে শুষ্ক হৃদয়েও রসের বীণা ঝঙ্কার দিল। শ্যামা শিস দিয়া গাইল—“অই বুঝি শ্যাম এল”—যেন প্রতিধ্বনি হইল “অই শ্যাম এল!” কুসুম-সুগন্ধি সমীরণ দিগ্ দিগন্তে সংবাদ দিল, “অই দেখ, শ্যাম এল।” দশদিকে আনন্দ-তরঙ্গের বন্যা ছুটিল। আকাশে প্রেমপূর্ণিমার উদয় হইল। রসময় শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ, মুখকান্তি আরক্তিম, হর্ষভাবে সমুজ্জ্বল, সমগ্র মুখমণ্ডলে যেন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এভাব দেখিয়া স্বরূপ ও রামরায়ের আনন্দের সীমা নাই। স্বরূপ ভাব বুঝিয়া গান ধরিলেন :—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে।
এতেক সহিল অবলা ব’লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ’লে।
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরানগরে ছিলে তো ভাল॥
এসব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশল কুশল মানি॥
সে সব দুঃখ গেলহে দূরে।
হারাণ রতন পাইনু ফিরে॥

কোকিলা আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ॥
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে॥

স্বরূপের হর্ষবিকশিত মধুর কণ্ঠে মহাপ্রভু যেন জাগিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে জাগরণ প্রাকৃত জাগরণের ন্যায় নহে। শ্রীমতী রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরঙ্গসুন্দর শ্রীরাধার ভাবে জাগরিত হইয়া মৃদুল কোমল কণ্ঠে গদ্‌গদস্বরে অস্ফুট ভাবে বলিলেন—"এস এস, বঁধু এস" এই বলিয়া নীরব হইলেন। মুখে মৃদু মধুর হাসি, কিন্তু স্বর আর ফুটিল না। তাহার পরে স্বরূপ গানের তান ধরিলেন ঃ—

এস এস বন্ধু এসো আঁধ আচরে বসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিল বিধি॥

মহাপ্রভু সতৃষ্ণভাবে চাহিয়া রহিলেন। নয়ন-কোণ আনন্দ-অশ্রুতে পূর্ণ হইল। স্বরূপ গান রাখিয়া প্রভুর শ্রীমুখের নব সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন,—দেখিলেন, প্রভুর ওষ্ঠ কাঁপিতেছে কিন্তু বাক্য-স্ফুরণ হইতেছে না, তিনি আরও দেখিলেন, মহাপ্রভু সহসা নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন, সমগ্র শ্রীমুখমণ্ডলে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাভাব লক্ষিত হইল। তিনি ভাবান্তর দেখিয়া আর একটি গান ধরিলেন—

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোহা হেরি মুখ চাঁদে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর যেন চাঁদে॥
আধ নয়নে দুহুঁ আধরূপ নেহারই
চাহনি আধহি ভাতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গে হেলা-হেলি
বিছুরল দুঃখ সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ গৌরী পরশে সেহ
মিলাইল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে এলায়ল আনন্দভরে
শিরীষ কুসুম কমলিনী॥
অতসী কুসুম সম শ্যাম-সুনায়র
নায়রী চম্পক গৌর
নব জলধর জিনি চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোর।
বিগলিত কেশ কুণ্ডল শিখিচন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুঁক প্রেম-রসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল॥
চণ্ডীদাস কহে দুঁহু রূপ নিরখিয়ে
বিছরল ইহ পরকাল।

শ্যাম সুন্দর বর সুন্দর রসরাজ
সুন্দরী মিলই রসাল ॥

স্বরূপ হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে গান শেষ করিলেন। রামরায় বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "চমৎকার! অতি চমৎকার! মধুর মিলন—মহাসম্মিলন!! এবার আমরা আমাদের নয়ন সমক্ষে যে মহামিলন প্রত্যক্ষ করিলাম, শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত কুঞ্জেও বুঝিবা সেরূপ মিলন কেহ কখনও দেখিতে পান নাই। শ্রীরূপ যথার্থই বলিয়াছেন,—"চৈতনাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্।"

রামরায়ের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই স্বরূপ বলিলেন "রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্" এই বলিয়া স্বরূপ মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। রামানন্দ বিহ্বলের ন্যায় মহাপ্রভুর শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিতে করিতে আনন্দে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন।

আত্ম-নিবেদন।

গম্ভীরা-মন্দির নীরব, নিস্তব্ধ। কাহারও কোন সাড়া নাই। বিশাল নীলগগনের মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিমাকাশে গড়াইয়া পড়িয়াছে। শঙ্কর ও গোবিন্দদাস এক কোণে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। গম্ভীরার কুসুমকাননের কুসুম-সুরভি-পরিশীলিত বসন্ত-সমীর ধীরে ধীরে গাছের পাতা

দোলাইয়া প্রবাহিত হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে একটি "বউ কথা কও" পাখী এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জ্যোৎস্নামাখা নৈশ নীলাকাশে আপনার রব মিশাইতেছিল।

বহুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, স্বরূপ তাঁহারই পদতলে বিলুণ্ঠিত, রামরায় ভাবাবিষ্ট। গোবিন্দ ও শঙ্কর সকল ভাব ভুলিয়া কেবল প্রভুর চেতনার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যখন দেখিলেন প্রভুর বাহ্যজ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে অমনি তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট আসিলেন। গোবিন্দের পদধ্বনি শুনিয়া স্বরূপ উঠিয়া বসিলেন।

প্রভু মধুর কোমল কণ্ঠে বলিলেন "মধুর মিলন তোমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে তো ?"

স্বরূপ বলিলেন "মধুর মিলন তো আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষেরই বিষয়। কিন্তু আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। তাই সর্ব্বদা তাহা দেখিতে পাই না, কিন্তু আজ যথেষ্টই সে সৌভাগ্য হইয়াছে।

রামরায় বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—হে রসরাজ-মহাভাব-মিলিত মূর্ত্তি, আজ তুমি যে দিব্যনয়ন দিয়াছ, আর যেন ইহা কাড়িয়া লইও না। এ মিলন-মাধুর্য্য-সন্দর্শন কেবলই তোমার অই শ্রীচরণের কৃপাপ্রসাদলভ্য। যাঁহারা তোমার শ্রীচরণে শরণাগত, এই সুধামাধুর্য্য কেবল তাঁহাদের আস্বাদ্য। আমি অধম বিষয়ী হইয়াও তোমার অযাচিত কৃপাপ্রসাদে অনন্যলভ্য মিলন-মাধুর্য্য সন্দর্শনের অধিকার পাইলাম।

মহাপ্রভু কোমলকণ্ঠে বলিলেন—"স্বরূপ, তোমার কৃপায় ব্রজ-

রসের কিছু কিছু আস্বাদন পাইলাম, এখন সাধ হয় আত্মনিবেদনের পদ আস্বাদন করি।

স্বরূপ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "সকলই প্রভুর ইচ্ছাধীন।" এই বলিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিলেন :—

"ভাবোল্লাসে ধনী বঁধুরে পাইয়া
ভাবে গদগদ কয়।
ব্রজ-পিরীতের প্রদীপ জ্বালিয়া
দীপ কি নিভাতে হয়॥
কালিয় কুটিল স্বভাব তোমার
কপট পিরীত যত।
ভুরু নচাইয়া মুচকি হাসিয়া
অবলা ভুলালে কত॥
পিরীতি রসের রসিক বোলাও
পিরীতি বুঝিতে নার।
মথুরা নগরে যত নাগরীর
পিরীতির ধার ধার॥
শুন গিরিধারী মথুরা বিহারী
নারীবধে নাহি ভয়।
পিরীতি করিয়া তোমারে ভজিলে
শেষে কি এ দশা হয়॥
পিরীতের দায় প্রাণ ছাড়া যায়
পিরীতি ছাড়িতে নারে।

পিরীতি-রসের পসরা তা কি
রাখালে বহিতে পারে ॥
রসিকের রীতি সহজ সরল
রাখালে তাহা কি জানে।”
চণ্ডীদাস কহে রাধার গঞ্জনা
সুধা-সম কানু মানে ॥

মহাপ্রভু। স্বরূপ, এতো শ্রীরাধার রসময়ী বক্রোক্তি! শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে কি বলিলেন?

স্বরূপ। এই বক্রোক্তির প্রত্যুত্তর, সরল, সরস ও সুমধুর। এই শুনুন :—

জপেতে তোমার নাম বংশী ধরি অনুপাম
তোমার চরণে পড়ি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গৌরী আইলাম ব্রজপুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ ॥
ধনি তোমার মহিমা জানে কে?
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাইয়া করিতে নারি শেষ।
গঞ্জন বচন তোর শুনি সুখের নাহিক ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি তেরছ নয়ন দেখি
বিকাইনু জনমে জনমে ॥

তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিনু কত
সে পিরীতে না পূরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হলো তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥

মহাপ্রভু। শ্রীকৃষ্ণ পরম উদার,—পরম প্রেমিক—নিখিল রসের আধার। উত্তর অতি উপযুক্তই হইয়াছে। ইহার পরে প্রেমময়ীর আত্মনিবেদন অবশ্যই অতি মধুর।

স্বরূপ। হাঁ প্রভু, শ্রীমতীর কয়েকটী আত্মনিবেদনের পদ শুনুন—

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি॥
তুমি বিদগধ গুণের সাগর
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী বেঁধেছ পিরীতি
অখিল ব্রজের রামা॥
অবলা জনের দোষ না লইবে
তিলে হয় কত দোষ।
তুমি দয়া করি কৃপা না ছাড়িহ
মোরে না করিহ রোষ॥
তিলেক না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি।

হয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া
চণ্ডীদাস আছে সাখী॥

মহাপ্রভু। অতি চমৎকার। তারপর, স্বরূপ।

স্বরূপ সুধাময় কণ্ঠে আবার গাইতে লাগিলেন :—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইনু দাসী॥
শিশুকাল হইতে আন নাহি চিতে
ও-পদ করেছি সার।
ধন মান জন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শত কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপন বলিব কায়।

শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—তারপর ?”

স্বরূপ আবার গাইলেন ঃ—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভয় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোমার চরণ খানি ॥

মহাপ্রভু। স্বরূপ, এই সকল পদে প্রেম-রস-ময় মধুর ভজনের পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি হয়। এই ভাবেই রসময় ও প্রেমময় চিত্তের পরমা তৃপ্তি। কিন্তু প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যঙ্গীকারব্যঞ্জক প্রত্যুত্তর ব্যতীত তো পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। ইহার উত্তরে শ্যামসুন্দর কি বলিলেন ?

স্বরূপ। শ্রীমতীর আত্মনিবেদনের প্রত্যুত্তরে প্রেমময় যাহা বলেন, তাহাও আত্মনিবেদনেরই পরাকাষ্ঠা।" এই বলিয়া স্বরূপ কোমল কণ্ঠে আবার গাইলেন :—

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে ॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহে কিশোরী চারিদিক হেরি
যেমন চাতক পাখী।
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
ভজন সাধন জানে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি॥

মহাপ্রভু। প্রেমানন্দ রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দ-ব্রজ-রসের ভজন-তত্ত্বের এখানেই পূর্ণতা।

এই বলিয়া প্রেমানন্দোৎফুল্ল শ্রীগৌরসুন্দর নীরব হইলেন। কিন্তু গম্ভীরা-মন্দিরে চিরদিনের তরে স্বরূপের সেই সুধামাখা গীতি-ঝঙ্কার রহিয়া গেল। সপার্ষদ আনন্দ-লীলা-রস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সে গীতি-সুধা-আস্বাদনের অধিকার বিস্তার করুন।

সম্পূর্ণ

জয় নিতাই

বৃন্দাবন দাস (বিজয়া)

